সোভিয়েট বিজ্ঞান

সোভিয়েট বিজ্ঞান

ডাইসন কার্টার



অনুবাদ করেছেন
চিন্মোহন সেহানবীশ



ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস
৮৭, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫৩

প্রকাশক

ধ্রুব মিত্র

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস

৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর

কালীপদ চৌধুরী

গণশক্তি প্রেস

৮-ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট

খালেদ চৌধুরী

ব্লক-নির্মাণ

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

দি সিণ্ডিকেট্স্ প্রেস

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

কলিকাতা

দাম দু টাকা চার আনা

আশ্চর্য নবজীবনের পূর্বাভাস

বিশ্ব ইতিহাসের সব থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে বিস্ময়কর কীর্তি অর্জন করেছে তারই ফলে রাশিয়া সম্পর্কে তীব্র কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সোভিয়েটের বীর যোদ্ধা, সোভিয়েট জীবনের প্রতিটি স্তরের খবর মিত্রশক্তিপুঞ্জের জনসাধারণ জানতে চায়। নাৎসী প্রচারযন্ত্র ও দেশে দেশে তাদেরই দালালেরা মিলে যে মিথ্যার পাহাড় গড়েছিল তারই আড়ালের সত্য সম্পর্কে তাদের আগ্রহের সীমা নেই।

কিন্তু সাধারণ মানুষ রাশিয়ার তথ্য, ছবি, গল্প ছাড়াও আরো কিছু চায়। জেনে শুনে বা অজান্তে আমরা সবাই আজ একটা অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন তুলছি। সোভিয়েট ইউনিয়নের আদিম কৃষিজীবী দেশ থেকে পৃথিবীর প্রবলতম শক্তিতে আশ্চর্য রূপান্তরের রহস্য কি?

সাধারণত এ প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হয় সেটি খুবই মামুলী। "সোভিয়েট ইউনিয়নের সাফল্যের কারণ হল এই যে সে দেশে ১৯১৭ সালে বিপ্লব হয়েছিল আর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জায়গায় সেখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এর থেকেই সব কিছু রহস্যের সন্ধান মিলবে।"

কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষ এই উত্তর থেকে কোন জিজ্ঞাসারই জবাব পাবে না।

১৯৩২ সালে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের লেখা পড়ে আমার দৃষ্টি যখন রাশিয়ার দিকে ফেরে তখন থেকেই আমি সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে

তথ্য সংগ্রহ করছি। "ইফ ইউ ওয়াণ্ট টু ইনভেণ্ট" নামে আমার বইতে আমি ১৯৩৮ সালে এ কথা বলেছিলাম যে সোভিয়েট ইউনিয়নে এমন সব পরিবর্তনের উপক্রম হয়েছে যার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর; আর সেই পরিবর্তন কেন যে অনিবার্য, অন্য দেশে এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে কেন এই বিস্ময়কর পরিবর্তন সে সব কিছুকে ছাপিয়ে যাবে তার কারণও দেখিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে এই সব ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে চলেছে। মানব জীবনের প্রত্যেক দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের আশ্চর্য অগ্রগতি ঘটেছে। বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধিৎসুদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠির বাইরে অনেক অগ্রগতির কথা কেউ জানেই না—আর বিশেষজ্ঞরাও সে খবর কাউকে জানাননি। শুধু সাধারণ মানুষ নয়—বিশেষজ্ঞ ও বৃত্তিজীবী মহলেরও অধিকাংশ লোক আজ রাশিয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

আসলে ব্যাপার হল এই :—

সোভিয়েট ইউনিয়নের মানুষের হাতে এক হাতিয়ার লুকোনো আছে। সেই হাতিয়ারের সাহায্যে তারা এমন ধরনের এক সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সংগঠন গড়েছে যা এতদিন অসম্ভব বলে মনে করা হোত। সেই গোপন হাতিয়ারের নাম বিজ্ঞান।

অধ্যাপক, এঞ্জিনীয়ার বা আইনস্টাইনদের বিজ্ঞানের কথা বলছি না। বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর বা সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাইরেকার বিজ্ঞানও এ নয়। সোভিয়েট বিজ্ঞান হল নূতন ধরনের এক বিজ্ঞান—এমন বিজ্ঞান যার মর্ম সাধারণ মানুষে বোঝে—যা তারা প্রয়োগ করে। এ বিজ্ঞান হল এক জীবন্ত শক্তি—শান্তি বা সংগ্রাম দুই সময়েই যা মানুষের সঙ্গী। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এরই স্বপ্ন দেখেছে...সেই বিজ্ঞান—মানুষের মন যে প্রচণ্ড হাতিয়ারকে গড়েছে—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

দিকে মানুষের বিজয় যাত্রাপথের প্রত্যেকটি বিপক্ষতা ও বাধা অপসারণের যে হাতিয়ার সমস্ত নরনারী ও শিশুর হাতে তা অর্পিত হয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে জীবনের এমন কোন দিক নেই যা এই নূতন ধরনের সোভিয়েট বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সোভিয়েটের যা কিছু গোলমেলে, আশ্চর্য, প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় বলে বোধ হয় সবই পরিষ্কার বোঝা যায় এই গুপ্ত হাতিয়ারের কষ্টিপাথরে। এই নূতন বিজ্ঞানের উদ্ভব হল কি করে, এর সিদ্ধি কতখানি, রাশিয়ার প্রত্যেক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও সব থেকে দরকারী কথা—লালফৌজের কীর্তি বিশ্বের সামনে নাটকীয়ভাবে এর যে প্রচণ্ড শক্তি উদ্‌ঘাটিত করেছে—তার কথা বলাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়:—পৃথিবীতে যত প্রাণী দেখা গেছে মানুষ তাদের থেকে বহুলাংশে পৃথক এই জন্য যে সে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে ব্যবহার করে। দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য নিজেকে পরিবর্তন করার বদলে সে আপনার সুবিধার জন্য দুনিয়াকে বদলায়! যে কোনো আবহাওয়ার উপযোগী সজ্জা সে প্রকৃতির কাছ থেকেই আদায় করে—তারই সাহায্যে খাদ্যের সংস্থান করে। প্রকৃতিকে সে বাধ্য করে তার শক্তি, জ্বালানি, আশ্রয় ও সব রকমের আরামের ব্যবস্থা জোগাতে। এক কথায়—প্রকৃতিকে নিজ ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করার ক্ষমতা আছে মানুষের।

কিন্তু এ সবের মধ্যেই একটা গলদ রয়েছে। আমরা জানি মানুষ বন থেকে বেরিয়ে কত দ্রুতগতিতে অন্য সব প্রাণীকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু যবে থেকে সে প্রকৃতিকে জয় করতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই এমন সব ব্যক্তি বা মানুষের দল দেখা গেছে যাদের গা থেকে জঙ্গলের বুনো গন্ধ কাটেনি। দুরন্ত পশুর মত এই সব অত্যাচারীরা তাদের

সঙ্গী মানুষের উপর জুলুম করতে চাইল—অবশ্য পশুর চেয়ে সুকৌশলে। তারাই আবিষ্কার করল বর্বর দাসত্ব প্রথা। মানুষ শত শত বছর ধরে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অবশেষে এর অবসান ঘটিয়েছে। এর পর পশু-মানবেরা অসংখ্য মানুষকে দারিদ্র্য ও দুর্গতির মধ্যে খাটিয়ে মারবার জন্য একটার পর একটা ব্যবস্থা পত্তন করেছে। সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাস প্রথা তারাই চালু করেছে। ধর্মের জন্য বীভৎস যুদ্ধ চালিয়েছে। মধ্যযুগে চেষ্টা করেছে সমস্ত চিন্তাশক্তির টুঁটি টিপে মারতে। তারপর নূতন নূতন দেশ জয় করে তারা নৃশংসভাবে সেখানকার মানুষদের সর্বস্বান্ত করবার চেষ্টা করেছে।

হিটলার ও তার চক্রসঙ্গীরা যে ব্যবস্থা দুনিয়াজোড়া করবার ফিকিরে ছিল—শেষপর্যন্ত এই বুনো মানুষেরা তাকেই কায়েম করতে চেষ্টা করেছে। সে ব্যবস্থার নাম ফ্যাসিজম।

যে সব শাসকেরা এই সব নানা ব্যবস্থা কার্যকরী করেছে তাঁদের সকলের মধ্যেই একটি মিল লক্ষ্য করা যায়। তারা অসংখ্য লোককে—সমাজের অধিকাংশ মানুষকেই তাদের প্রচণ্ড শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞান রাখবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বহু যুগ আগেই মানুষ সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণের জন্য প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহারের স্বপ্ন দেখেছে। ক্ষুধা, শীত, রোগ, দুঃখের বিরুদ্ধে অন্ধভাবে লড়াই না করে প্রকৃতিকে জয় করবার জন্য, তীব্র জীবনসংগ্রামের দায় থেকে মুক্তির জন্য, অত্যাচারীর হাত থেকে খালাস পাবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ একজোট হতে চেয়েছে।

এই স্বপ্নকে কি ভাবে জীবন্ত বাস্তবে পরিণত করা যায় মানুষ তা আবিষ্কার করার আগে শত শত বছর কেটে গেল। অবশেষে রহস্যের সমাধান হল। এ হল এক অস্ত্র—প্রকৃতিকে বশ করে তাকে মানবকল্যাণের কাজে নিয়োগ করার হাতিয়ার। এ অস্ত্রের নাম বিজ্ঞান।

মানুষ এই আশ্চর্য শব্দটা উচ্চারণ করামাত্র অত্যাচারীরা প্রচণ্ড রকম ক্ষেপে উঠল। তারা যখন দেখল যে বিজ্ঞান মানুষকে চিরকালের মত অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দেবে, ভয় ও কুসংস্কারের বন্ধন ঘোচাবে তখন কর্তারা হুকুম দিলেন বিজ্ঞানকে নিঃশেষ করতে। সেই তমসার যুগে শত শত বছর ধরে বৈজ্ঞানিকদের পরে চলল অকথ্য অত্যাচার। পুড়িয়ে মারা হল, তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করা হল। কিন্তু এতেও থামানো গেল না। মঠই ছিল তখনকার একমাত্র জায়গা যেখানে গুপ্ত ধন রাখা সম্ভব ছিল। তাই শত শত নিরীহ ধর্মযাজক বিজ্ঞানের মশালকে কোনক্রমে অনির্বাণ রাখল। সে সব বীরদের নাম আমরা জানিও না।

বিজ্ঞানের আবির্ভাবের পরবর্তী ঘটনার কথাও সবাই জানে। অত্যাচারীরা যখন দেখল যে বিজ্ঞানকে কোনক্রমেই নির্মূল করা যাবে না তখন তারা তাকে আত্মসাৎ করল। বিজ্ঞানকে ব্যবহারে লাগিয়ে তারা আনলো শিল্প-বিপ্লব। লক্ষ লক্ষ নরনারী ক্ষেত থেকে চালান হল কারখানায়। সেখানে বিজ্ঞানের সৃষ্টি—নানা যন্ত্রপাতিতে তাদের নিয়োগ করা হল। তারা পেল না বিজ্ঞানের অধিকার। তাদের হাত থেকে বিজ্ঞানকে ছিনিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করল সেই বুনো মানুষেরা।

কিন্তু রাশিয়ায় বিজ্ঞান আবার প্রত্যার্পিত হয়েছে জনসাধারণের হাতে। প্রত্যেক নরনারী ও শিশু পেয়েছে এর অধিকার। ফলে এটি সব থেকে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে "এই বিজ্ঞানকে গোপন হাতিয়ার বলা হচ্ছে কেন? রাশিয়ার লোকেরা কি দুনিয়ার কাছে এর রহস্য উদ্ঘাটিত করবে না?"

রুশেরা চেয়েছিল আমাদের এর খবর জানাতে। তারা চায়নি কোন কিছু গোপন করতে। তবে লুকোলো কে?

লুকোলো তারাই যারা প্রত্যেক দেশে মহাযুদ্ধের পর থেকেই ফ্যাসিজমের নির্মম ব্যবস্থা গড়ে তুলছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সারা দুনিয়াকে দাসত্ব বন্ধনে বাঁধা আর নূতন বিজ্ঞানকে জনসাধারণের হাতে যেতে না দেওয়া। বিশ বছর ধরে তারা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছে। কারণ তারা জানত যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি রাশিয়ার গুপ্ত হাতিয়ার অর্থাৎ নূতন বিজ্ঞানের সন্ধান পায় তবে অত্যাচারীদের দিন ফুরবে, যুদ্ধ মারামারির অবসান হবে আর মানুষ অবশেষে মুক্ত পৃথিবীর স্বাধীন বাসিন্দা হিসাবে পূর্ণ গৌরবের অধিকারী হবে।

নূতন সোভিয়েট বিজ্ঞান কোন নির্মম যান্ত্রিক শক্তি নয়—এমন জিনিসও নয়, যাকে বন্দী বা হত্যা করা যায়। মানব হৃদয়ের দুটি সব থেকে সুন্দর আবেগের উপর এর প্রতিষ্ঠা—নরনারী ও শিশুর পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা আর মানবতার আদর্শের প্রতি সকলের সুদৃঢ় নিষ্ঠা।

ভালবাসা ও শৌর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান। দেখা যাক এর সহায়তায় সোভিয়েট ইউনিয়নে কি ধরনের জীবন ও মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

রাশিয়ার প্রত্যুষ

আমরা জানি রুশ বিপ্লব আরম্ভ হয় ১৯১৭ সালে। তারপর বছরের পর বছর চলল গৃহযুদ্ধ। তারপর এল বহির্শত্রুর হস্তক্ষেপজাত যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত লালফৌজ যখন সমস্ত আক্রমণকারীদের সোভিয়েট ভূমি থেকে হটালো তখন জাতির শিল্পের অবস্থা শোচনীয় কারণ ধ্বংসের রূপ ছিল ভয়াবহ। তবে ১৯১৪ সালের আগেও জারের রাশিয়া শিল্প, কৃষি ও সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ জাতি হিসাবে কুখ্যাত ছিল। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অবিশ্বাস্য অভাব। ইংলণ্ড, য়ুরোপ ও আমেরিকার সুদীর্ঘ ও গৌরবময় বিজ্ঞানের ইতিহাসের কথা মনে রাখলে আশ্চর্য বোধ হয় যে 'পিটার দি গ্রেট'ও রাশিয়ায় একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

তিনি যা পারেননি তাঁর বিধবা রানী প্রথম ক্যাথেরিন তা করতে সফল হন। তিনিই ১৭২৫ সালে রুশ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। বহু বছর ধরে কিন্তু একাডেমীতে কোন দেশীয় সভ্য ছিল না—সমস্ত রুশ সাম্রাজ্যে একজনও বৈজ্ঞানিক মেলেনি।

ইতিহাসের আর একটি ব্যাপারও অবিশ্বাস্য ঠেকে। সমস্ত রাশিয়ায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

একশ বছর কেটে গেল। খুব দরাজ মেজাজে জার প্রথম নিকলাস পৃথিবীর মধ্যে এক সময়ে সব থেকে বড় বিরাট পুলকোভা মানমন্দির (লেনিনগ্রাডের চারিপাশে যে যুদ্ধ চলেছিল তার প্রবলতম ঝাপটা গেছে এর উপর) প্রতিষ্ঠা করলেন আর সেটিকে বোঝাই করলেন বিদেশীদের দিয়ে। আরো পঞ্চাশ

বছর যাবার পর রুশ বৈজ্ঞানিকদের নাম পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বিশ্বযুদ্ধ লাগবার সময় জারের সাম্রাজ্যে মূলবিজ্ঞান পদার্থবিদ্যায় ৫০ জনের বেশী বিশেষজ্ঞ পাওয়া যেত না। জার্মানীতে ছিল হাজার হাজার পদার্থবিদ। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স প্রত্যেকেরই ছিল শত শত।

মহাযুদ্ধের সময় জার আমলের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেশত্যাগী হলেন। পরে বিপ্লবের ধোঁয়া অপসৃত হলে দেখা গেল যে মাত্র জনবারো খ্যাতনামা পণ্ডিত বাকী আছেন। যেমন পাভ্‌লভ্, কুর্ণাকড ও গুর্‌ভিট্‌সের মত লোক। বাকী সবাই পলাতক। যাঁরা থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা বিপ্লবের ফলে যে সেভিয়েটতন্ত্র গড়ে উঠেছিল সোজাসুজি তার বিপক্ষতা করলেন। আমাদের কাছে অন্য কথা বলা হলেও কিন্তু এইসব প্রতিবাদকারীদের কোন ক্ষতি করা হয়নি।

তাঁদের কি হল? একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। বিপ্লব যখন তাঁর দেশকে আচ্ছন্ন করে তখন আইভান মিচুরিনের বয়স ছিল ৬২ বছর। সারা জীবন তিনি কাটিয়েছিলেন প্রাণীতত্ত্বের গবেষণায়। জার-সরকারের কাছ থেকে তিনি প্রায় কোন আর্থিক সাহায্যই পেতেন না। নির্বোধ রাজপুরুষ ও চরিত্রহীন অভিজাতের দল যখন জনসাধারণের দৌলতে ভোগবিলাসে মত্ত থাকত, তখন মিচুরিনের গবেষণা পোষকতার অভাবে শুকিয়ে মরত। মহাযুদ্ধ যখন লাগল মিচুরিন তখন ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ। তিনি লিখলেন :—

"বছরের পর বছর কেটে গেছে। আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। পুরস্কারের চিন্তা না করে সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য সারা জীবন কঠোর পরিশ্রমে কাটিয়ে বৃদ্ধ বয়সে কোন ভরসা না থাকার মত ভীষণ নৈরাশ্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে!"

কিন্তু মিচুরিন তখন মারা যাননি। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। জারের ছুনিয়ার সমস্ত গ্লানি ছুর্নীতি সম্পূর্ণ অপসারিত হতে তিনি দেখলেন। নূতন রাশিয়ার অপ্রতিহত অভিযানের ঢেউ তাঁকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর জীবন বুঝি ফুরিয়ে গেছে —কিন্তু এর পর বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আবার নূতন গবেষণায় মাতলেন। মৃত্যুর ঠিক আগে—তখন তাঁর বয়স প্রায় ৮০ বছর, তিনি লিখলেন :—

"আমার জীবনের রং ফিরে গেছে। সমস্ত জীবন পরিবর্তিত হয়েছে— পূর্ণ হয়ে উঠেছে আশ্চর্য আদর্শনিষ্ঠায়—জীবন আজ আশ্চর্য সুন্দর।"

পুরোনো বহু রুশ বৈজ্ঞানিকের জীবনেই এই ধরনের পরিবর্তন এল। যেমন বিখ্যাত পাভলভ্ একদা সোভিয়েটতন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করতেন। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল সোভিয়েট সরকার ততই তাঁকে তার কাজ বিপুলভাবে বিস্তৃত ও পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সাহায্য করতে লাগল। তিনিও মেতে উঠলেন উৎসাহে, বৈজ্ঞানিক জগতকে শোনালেন নূতন বিজ্ঞানের কথা। কিন্তু তখন আর তাঁর কথা কেউ শুনতে চাইল না। পাভলভ্ যখন সোভিয়েটকে আক্রমণ করতেন তখন সবাই ছিল তাঁর প্রশংসায় মুখর। পরে যখন তিনি সোভিয়েটের কীর্তি ঘোষণা করলেন তখন তাঁর ভাগ্যে জুটল উপেক্ষা। সোভিয়েটকে যারা ঘৃণা করত তারা পাভ্লভের কণ্ঠে যে সত্য উচ্চারিত হচ্ছিল তা যাতে লোকের কানে না পৌঁছোয় তার চেষ্টা করতে লাগল। তাচ্ছিল্য করে তারা বলল "বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা মারা গেলে রাশিয়ায় আর মাথাওয়ালা লোক থাকবে না। সোভিয়েটে কেমন বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্টি হয় দেখা যাক!"

তারা কি দেখল তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি :—

সূর্য আজ সোভিয়েটের বশে

গল্পটার শুরু অনেক বছর আগে—জার আমলের রাশিয়ায়, সেণ্টপিটার্স-বুর্গের এক রৌদ্রস্নাত বাগানে।

এক বৃদ্ধ পক্কশ্মশ্রু অধ্যাপকের হাতে তখনি একটি খবরের কাগজ এসে পৌঁচেছে। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ জোড়া ক্রোধে জ্বলে উঠল। কাগজটা হচ্ছে মস্কোয় ছাপা 'গ্রাজদানিন'। এর মালিক প্রবল পরাক্রম কাউণ্ট মেশ্‌চেরস্কি।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের 'পরে এই বনেদী ভদ্রলোকের ছিল অসীম ঘৃণা। অধ্যাপক টিমিরিয়াজেভকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় তাঁর ত্রুটি ছিল না। এবার তাঁর কাগজে তিনি জার ও গ্রীক চার্চের দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের শরণাপন্ন হলেন।

কাউণ্ট মেশ্‌চেরস্কি কিন্তু এতই নির্বোধ যে তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যের শেষ লাইন পড়ে সারা মস্কোয় হাসির রোল উঠল। তিনি লিখেছেন "এই অধ্যাপক টিমিরিয়াজেভ যে সব ধর্মবিরুদ্ধ গবেষণা চালাচ্ছে তা ঈশ্বরের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে আর পুরোপুরি সরকারের খরচায় আসলে সে প্রকৃতির রাজ্য থেকে ভগবানকে নির্বাসন দিচ্ছে।"

টিমিরিয়াজেভ প্রাণ খুলে হাসলেন। পরমুহূর্তেই কিন্তু আবার গম্ভীর হলেন। মেশ্‌চেরস্কির হাতে তাঁর সর্বনাশের ক্ষমতা যে রয়েছে যথেষ্ট। বৃদ্ধ তবু ধীরে ধীরে বললেন "আমার আর হারাবার ভয় কিসের? সারা জীবন রুশ চাষীদের জন্যই খেটেছি। জমিদারদের এই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে জমি উর্বর হলে সবারই পেট ভরবে। ওরা

শোনেনি। একটা গাড়ীর চাকা তৈলাক্ত করা যায় এমন ঘিলু সমস্ত রুশ অভিজাত শ্রেণীর ঘটে নেই।”

এর পর আজীবন প্রচণ্ড বিপক্ষতার সঙ্গে লড়াইএ অভ্যস্ত বৃদ্ধ কলম নিয়ে বসলেন মেশ্‌চেরস্কির কড়া জবাব লিখতে।

১৯০৮ সালে টিমিরিয়াজেভ যা লিখেছিলেন আজকের দিনে মিত্রশক্তি-পুঞ্জের পক্ষে তা ভবিষ্যদ্বাণীর মত। “মানুষের মধ্যে যাদের মুখ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো আর যারা কদর্য অতীতের মায়া কাটাতে পারে না—এই দুইএর দুনিয়াজোড়া আসন্ন লড়াইএ স্বাধীনতার পতাকার ’পরে এই কথা লেখা থাকবে—বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র। এই তোমাদের বিজয় চিহ্ন।”

একটি উদারমতাবলম্বী কাগজে এই উত্তর বেরোলো। বনেদীদের দল উঠল ক্ষেপে। প্রবল পরাক্রান্ত গুপ্ত পুলিশ টিমিরিয়াজেভকে জেলে পাঠাতে চাইল। কিন্তু কিছু করা গেল না। বিজ্ঞান জগতে অধ্যাপক ছিলেন সুপরিচিত। তাই ১৯০৫ সালের অত্যাচারের পর যে রকম আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল পাছে সেই রকম আর একবার হয় জারের মনে ছিল সেই ভয়।

রাজপুরুষেরা এই ভালমানুষ বৃদ্ধকে ঘৃণা কর্‌ত কেন? তিনি কি বিপ্লবী ছিলেন? না। তিনি কি তবে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করতেন? মোটেই না। তবে কি?

সনাতন রাশিয়ার শাসকেরা টিমিরিয়াজেভকে ঘৃণা করত কারণ তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক—যাঁর সাধনা ছিল রাশিয়াকে বৈজ্ঞানিক উন্নতির দ্বারা সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা, ভূয়া ধর্মের আড়ালে যে কুসংস্কার ও জঘন্য অনগ্রসরতা লুকোনো ছিল তাকে ধ্বংস করা।

কাউণ্ট মেঁশ্‌চেরস্কি ও তাঁর দলের লোকদের হাস্যকর মনোভাব যুদ্ধের আগেকার রাশিয়ার এই ছোট হাসির গল্পটি থেকে বোঝা যায়। একজন

কৃষিবিশারদ একবার কয়েকজন জমিদারের মাথায় প্রাণপণে এই কথাটা ঢোকাবার চেষ্টা করছিলেন যে বৈজ্ঞানিক কৃষির সঙ্গে 'প্রকৃতির রাজ্য থেকে ঈশ্বরের নির্বাসনের' কোন সম্বন্ধ নেই। জমি সম্পর্কে সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগই হল তার মূল কথা।

বিশেষজ্ঞ বললেন "যেমন ধরুন বসে বসে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলে শুধু সময়টা নষ্ট হবে। আপনার আর্জি অনুসারে ঈশ্বর বাগানে জল ঢালতে শুরু করবেন এমন নিশ্চয়ই আশা করা যায় না! প্রকৃতির নিয়মে যে মেঘ জমে ওঠে তার থেকেই বৃষ্টি হয়। এই ভাবেই ঈশ্বর কাজ চালান—কল ঘুরিয়ে জল ঢালবার মত করে নয়।"

একজন বনেদী ভদ্রলোক করুণ হাসি হাসলেন। বললেন "আহা ছোকরা! তুমি বোঝ না। দু রকমের বৃষ্টি আছে। অল্প এক পশলা যখন বৃষ্টি হয় যাতে ধূলোও মরে না তখন তাকে বলে বৈজ্ঞানিক বৃষ্টি। কিন্তু যখন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে মাঠ ঘাট থৈ থৈ করে তখন হয় ভগবানের বৃষ্টি।"

এই ধরনের ছেলেমানুষী বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে রাশিয়া শুকিয়ে মরছিল। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কীটপতঙ্গ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি আপদগুলি একটার পর একটা পুরোনো পৃথিবীর সব থেকে উর্বর আবাদী জমির উপর হানা দিত। টিমিরিয়াজেভের মত লোকেরা দেশকে দুর্দশার পাঁক থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই আজ এই নূতন সাধারণতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তির পরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। আজ বৈজ্ঞানিক মহল স্বীকার করে যে কৃষির উন্নতির দিক থেকে কোন জাতিই রাশিয়ার সমকক্ষ নয়। সে দেশের বৈজ্ঞানিকেরা আজ বিশ্ববিখ্যাত। রাশিয়ার মাটি যে বিরাটভাবে ও যে পদ্ধতিতে চাষ করা হয় পৃথিবীর অন্যত্র তা অজ্ঞাত। সোভিয়েটের কতকগুলি সাম্প্রতিক অগ্রগতি তো বিস্ময়কর।

অবশ্য রুশ দেশের যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকার্য, বিরাট ট্রাক্টর-কেন্দ্র, কুলাক বা অবস্থাপন্ন চাষীদের আধিপত্যের অবসান ও তার যৌথ কৃষির সম্পর্কে অনেক কথাই লেখা হয়েছে। কিন্তু এখানে ও সব ব্যাপারে আমরা ব্যস্ত নই।

আমরা যে গল্প শুরু করেছি সেইটাই চালাতে চাই। অথচ এখানে দেখছি সেটি মুখ ঘুরিয়ে পিছু হটে চলেছে, বিজ্ঞান সম্পর্কিত গল্পের বেলা অনেক সময়েই যা হয়ে থাকে। কারণ অধ্যাপক টিমিরিয়াজেভের অনেক আগে থেকেই এ গল্পের সূত্রপাত।

হাজার হাজার বছর আগে আদিম মানুষ সূর্যের পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত যে সূর্য থেকেই প্রাণের উদ্ভব। অনেক শতাব্দী কেটে গেল—সূর্য পূজারীরাও অন্তর্ধান করল আর তারপর সূর্য যে প্রাণদাতা এই প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন বৈজ্ঞানিকেরা। তখন এ কথা পরিষ্কার হল যে দুনিয়ার সমস্ত প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সূর্যের পরে নির্ভরশীল।

মানুষ সম্পর্কে এই প্রশ্ন নিয়ে প্রথম অনুসন্ধান চালান রবার্ট মেয়ার। জাভায় থাকার সময় এই বিখ্যাত জার্মান ডাক্তার আবিষ্কার করেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের রক্ত শীতের দেশের বাসিন্দাদের রক্ত থেকে আলাদা ধরনের। এর থেকেই তিনি যে তত্ত্বে পৌঁছলেন তা আজ স্কুলের ছাত্ররাও জানে যে নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে যে অক্সিজেন যায় তারই সাহায্যে খাদ্যকে আত্মসাৎ করে মানুষের শরীর গরম থাকে।

বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মাটি থেকে জল ও খাদ্য আর সূর্য থেকে শক্তি—এই সব মিলিয়ে সৃষ্টি হয় একটি ঘাসের শিষ। গরুতে ঘাস খায়। আপনি আবার তার মাংস খান। আপনার

পেটে গিয়ে তা হজম হয়। কতকটা মাংস এইভাবে আত্মসাৎ করা হয়—আর তারপর আপনি কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রশ্বাসের সঙ্গে বার করে দেন। সূর্যের যে তাপে ঘাস সৃষ্টি করে তাই আবার আপনার দেহের তাপ হিসাবে, বাহুর শক্তি হিসাবে দেখা দেয়।

আজ আমাদের কাছে এ সব হল পুরোনো কথা। এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। কিন্তু একশ বছরও হয় নি জীবনধারা সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা দেবার জন্য ডাঃ মেয়ারকে পাঠান হয় পাগলা গারদে। তাঁর অমর অগ্রজ গ্যালিলিওর মত তাঁর পরেও পীড়ন চলে যাতে যে সহজ সত্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তা তিনি অস্বীকার করেন। তমসার যুগের কথা এ নয়—এ হল গত শতাব্দীর মাঝামাঝির ঘটনা। মেয়ারের পরে যারা অত্যাচার চালায় তারা বিজ্ঞানকে, সত্যকে ঘৃণা করত। তারা হুকুম তালিম করছিল অত্যাচারীদের, সেই সব বুনো মনওয়ালা মানুষদের, যারা সব থেকে ভয় করত বিজ্ঞানকে।

কিন্তু সত্যকে চাপা রাখা গেল না। কিছু দিনের মধ্যেই আর এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, হেল্মহোল্টস্ স্পষ্ট-ভাষায় বললেন "সূর্যের আলো গ্রহণ করে গাছেরা বেড়ে ওঠে। গাছের মধ্যে সূর্যের আলো মিশে গেলে উদ্ভব হয় 'দাহ্য' পদার্থের। তবু এখনও এমন কোন গবেষণার কথা আমরা জানি না যার দ্বারা আমরা সঠিক বলতে পারি যে সূর্যরশ্মি অদৃশ্য হওয়ার পিছনে যে প্রাণশক্তি আছে তারই অনুপাতে গাছের মধ্যে রাসায়নিক পদার্থ গড়ে ওঠে।"

কৃষির উন্নতির পক্ষে এই শেষ কথাটি ঐতিহাসিক। সনাতন কৃষির ইতিহাসে এ হল এক মোড় ফেরার স্মারকচিহ্ন। কিন্তু সে সময়ে হেল্মহোল্টস্ও এ কথা ভাবতে পারে নি।

অধ্যাপক টিমিরিয়াজেভ্ সৌরশক্তি থেকেই যে গাছ বেড়ে ওঠে, নিশ্চিত ভাবে সে কথা প্রমাণের জন্য ৫০ বছর ধরে গবেষণা চালালেন। তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই তাঁর সমগ্র কাজ থেকেই বিস্ময়কর ফল দেখা গেল।

টিমিরিয়াজেভ্ স্বপ্নাতুর বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তাঁর সর্বপ্রধান সাধনা ছিল চাষীর দুর্গতি ঘুচিয়ে তার জীবনের উন্নতি—বৃষ্টি, ঝড়, সূর্যতাপের নানা অনিশ্চয়তার পরে নির্ভরশীলতা দূর করে দৃঢ়তর ভিত্তির পরে কৃষিকার্যের প্রতিষ্ঠা। তিনি লিখলেন "শুধু দর্শকের ভূমিকায় কোন বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট হতে পারে না। গবেষক হিসাবে তাঁর কাজ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষের যুক্তি ও ইচ্ছার কাছে প্রাকৃতিক শক্তিকে নতি স্বীকার করানোই হল তাঁর বিপুল সাধনা।"

এ হল বিপ্লবের আগে। যে ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে সোভিয়েট ভূমিষ্ঠ হল সেই সময়েই বৃদ্ধ টিমিরিয়াজেভ্ মারা গেলেন। একটা বিরাট সম্ভাবনা যে রূপ নিচ্ছে এ কথা বুঝবার মত সময় তিনি বেঁচে ছিলেন। মানবকল্যাণের জন্য, "মানুষের যুক্তি ও ইচ্ছার কাছে প্রাকৃতিক শক্তিকে নতি স্বীকার করানোর জন্য" মানুষ বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করে সমগ্র বিশ্বের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যত—এ দৃশ্য তিনি দেখে গিয়েছিলেন।

এবার আমাদের কাহিনী দ্রুত চলবে। এর জের টানা যাবে আবার পনেরো বছর পরে সুদূর সাইবেরিয়ায়। সেখানে ইয়েফ্রেমভ নামে এক তরুণ সাইবেরিয়ান চাষীর হাতে কেমন করে জানি বৃদ্ধ অধ্যাপকের কয়েকটি বই পড়ে। পড়ে সেই যুবকের রোমাঞ্চ হল। বন্ধুদের সে বলল "আমরা দর্শক হয়েই তুষ্ট থাকতে পারি না। আমাদের কাজ প্রকৃতিকে বশ মানানো।"

বন্ধুরা হেসে বলল "কিন্তু কি উপায়ে? এক আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বানিয়ে?"

ইয়েফ্রেমভ প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করল। সূর্যরশ্মি সম্পর্কে বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাজ তাকে মুগ্ধ করেছিল। বারবার সে গবেষণাগুলির কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ল। ক্রমে তার মনে রূপ নিল এক আশ্চর্য চিন্তা।

সাইবেরিয়ান চাষীদের সাহায্য করার জন্য যে সব কৃষি-বৈজ্ঞানিকদের পাঠানো হয়েছিল তাদের সে বলল "গাছেরা অবশ্য মাটি থেকেই খাদ্য জল সংগ্রহ করে। কাজেই যেখানে সম্ভব সেচকার্য ও সার ব্যবহার করা ভালই। কিন্তু সত্যিই কি আপনারা মনে করেন যে গমের পক্ষে খাদ্যজল অত্যন্ত দরকারী?"

বিশেষজ্ঞেরা অবাক হয়ে গেল। "বাপ্স, এ ছাড়া দরকারী জিনিস আর কি হতে পারে? খাদ্য জল ছাড়া গাছ বাড়তেই পারে না।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সূর্যতাপও তো লাগে।"

হাসির রোল উঠল। "হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর পরে আমরা সূর্যকে বশ করতে পারব, আর প্রয়োজন মত আমাদের গমের জন্য সূর্যের আলো দিতে পারব।"

ইয়েফ্রেমভের চোখ অদ্ভুত আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ টিমিরিয়াজেভের বই পড়ে পর্যন্ত যে বিরাট চিন্তা তার মাথায় ঘুরছিল সেটা তার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ল। শান্তভাবে সে বলল "আমার মনে হয় সূর্যকে বশ করার কৌশল এখনই আমার আয়ত্তে।"

এই বলে সে ভালোভাবে চিন্তা করবার জন্য চলে গেল। তার ধারণা সে লিখেও ফেলল। সেটি হল এই "খাদ্যজল বাতাসকে শস্যে পরিণত করার জন্য গাছেরা যে শক্তি প্রয়োগ করে—সূর্যতাপই যদি

তার যোগান দেয় তবে সেটাই হল সব থেকে দরকারী জিনিস। একর পিছু শস্যের পরিমাণ বাড়াতে হলে প্রত্যেক একরে শস্য ফলাতে যতটা সূর্যতাপ লাগে তার পরিমাণও বাড়াতে হবে।"

কিন্তু কি ভাবে?

ইয়েফ্রেমভের কাছে ছিল এর উত্তর। বুঝতে পারছেন কি? হয়ত পারছেন না। শত শত বছর ধরে এ কথা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি কৃষিবিশারদদের চোখ এড়িয়ে গেছে। প্রাচীন কালের বিখ্যাত উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রতিযোগিতায় মিশরের স্ফিংক্স্ অনায়াসেই এ ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতে পারত।

উত্তরটি অসম্ভব রকম সহজ। একর পিছু বেশী শস্য পেতে হলে একর পিছু বেশী সূর্যতাপ ব্যবহার করতে হবে, এ কাজ করবার জন্য প্রয়োজন কিছু গাছ রোপনের সংখ্যা বাড়ানো।

ইয়েফ্রেমভ যখন বিশেষজ্ঞদের এ কথা বোঝাতে চাইল তখন তারা ওকে পাগল ঠাওরালো। আপনারাও হয়ত তাই ভাবছেন। একর পিছু বেশী গাছ কেমন করে লাগানো সম্ভব?

ইয়েফ্রেমভ সহজভাবে জানালো "আমি সে সব জানি না। কিন্তু আমি বার করব এর উপায়। আমায় ঠিক করে বলুন প্রত্যেক বর্গ ফুট জমিতে কত শিষ শস্য লাগানো সম্ভব আপনারা জানেন কি?"

কৃষিবিশারদেরা মুখ লাল করে শুধু ইয়েফ্রেমভকে সময় নষ্ট না করতে উপদেশ দিতে লাগল। একর পিছু বেশী শস্য জন্মানো সম্ভব হলে শত শত বছর আগেই মানুষ তা করে ফেলত। কিন্তু ইয়েফ্রেমভকে এ উত্তর খুসী করতে পারল না।

এখন ভাবুন দেখি আমাদের দেশের কোন জমিতে যদি ইয়েফ্রেমভকে দিন মজুরী করতে হত তবে সে কি করতে পারত? সরকার কি পরীক্ষা চালানোর জমিতে তাকে গবেষণা করতে দিত? নিশ্চয়ই

না। যে লোকটার কোন কালেজী ডিগ্রী নেই তার উচিত পাগলামি ভুলে আপন কাজে মন দেওয়া!

কিন্তু রাশিয়ায় ব্যবস্থা অন্য রকম। সে দেশে বিজ্ঞান শুধু অধ্যাপক ও ডিগ্রীধারীদের আয়ত্তাধীন কোন রহস্যময় ব্যাপার নয়। কৃষিক্ষেত্র-গুলিরও চেহারা আলাদা ধরনের। ইয়েক্রেমভ এক যৌথ কৃষিক্ষেত্রে কাজ করত। সেটি ছিল একটি বিরাট জমি যার মালিক হল শত শত চাষী ও তাদের স্ত্রীরা। এরা আপন হাতে চাষ করত। তরুণ চাষী এক সভা ডাকলো। সেখানে সবাই এলো। কথাবার্তাও হয়ে গেল। ঠিক হল ইয়েক্রেমভ গবেষণা করবে। তাকে জমি যোগানো হল। অনেক সাইবেরিয়ান স্ত্রী ও পুরুষ চাষী তাকে সাহায্য করতে এগোলো।

সেই গবেষণা থেকে যা বেরোলো সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে তার প্রচণ্ড ধাক্কা পৌছল। 'ইয়েক্রেমভ' কথাটি বিভিন্ন ভাষায় একটি নূতন শব্দ হিসাবে গৃহীত হল। আজ হাজার হাজার চাষী ও কৃষিবিদ নিজেদের "ইয়েক্রেমভপন্থী" বলেন।

প্রথম গবেষণা আরম্ভ হল এই ভাবে ঃ—ইয়েক্রেমভ ও তার সহকর্মীরা হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাদী জমিতে একটির পর একটি বীজ লাগালো। দুটি বীজের মধ্যেকার দূরত্ব তারা সযত্নে কমাতে বাড়াতে লাগল। কোন জমিতে দূরত্ব হল আধ ইঞ্চি, কোথাও $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি, কোথাও বা এক ইঞ্চি বা ঐ ধরনের কিছু। আসলে বিভিন্ন জমির গাছগুলির মধ্যেকার জায়গার পার্থক্য আধ ইঞ্চিরও কম ছিল। গবেষকরা অত্যন্ত সাবধানে কাজ চালালো কারণ তারা জানতো তাদের লক্ষ্য কি। ফলের দিক থেকে এক ইঞ্চির এক দশমাংশের গুরুত্ব খুব বেশী হওয়া সম্ভব।

অল্পদিনের মধ্যেই ইয়েক্রেমভ প্রমাণ করল যে একটি গমের চারার জন্য ১½ বর্গ ইঞ্চি জমিই যথেষ্ট। অর্থাৎ এক একর জমিতে বহু বীজ রোওয়া সম্ভব আর সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিই বেশ সতেজভাবে বেড়ে উঠবার মত সূর্যের আলো পেতে পারে। হঠাৎ চাষীরা দেখতে পেল কি হয়েছে? সনাতন পদ্ধতির চেয়ে একর পিছু তারা পাঁচগুণ বেশী বীজ লাগিয়েছে ও ফসল ফলিয়েছে।

অন্যভাবেও জিনিসটা দেখা যায়। বীজ লাগানোর সনাতন পদ্ধতিতে পাঁচ একর জমিতে যে শস্য ফলে ইয়েক্রেমভ দেখাল যে তা এক একরেই ফলানো যায়। এই ফলাফল যখন ঘোষিত হল তখন সোভিয়েট কৃষিবিদরা ছুটলেন ইয়েক্রেমভের জমিতে। আপনারা ভাবতে পারেন ইয়েক্রেমভের মত একজন চাষী এই রকম আবিষ্কার ঘোষণা করায় এঁরা চটে না গেলেও অন্তত সংশয়াকুল হবেন। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষিবিদেরা চাষী আর চাষীরা কৃষিবিদ—কৃষি ও নব বিজ্ঞান সেখানে এক পথের পথিক। ইয়েক্রেমভকে উপেক্ষা না করে একজন বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বাস্কি বললেন, গবেষণা ক্ষেত্রে বছরের পর বছর পরীক্ষা চালিয়ে যে সব তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরা হয়েছিল ইয়েক্রেমভের কাজ ঠিক তার উল্টো। বলা হত যে বীজ বপনের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় আর পাওয়া সম্ভব নয়। ইয়েক্রেমভ এ কথা মিথ্যা প্রমাণ করেছে। অতএব এই মতবাদগুলি ভুল আর তার প্রমাণও মিথ্যা। গবেষণাক্ষেত্রগুলিও ভুল পথে চলেছিল। ইয়েক্রেমভই ঠিক। সেই হচ্ছে সাচ্চা সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক কারণ আমাদের বিজ্ঞান হচ্ছে সমগ্র মানবতার জন্য—সমস্ত মানুষের কল্যাণ যাতে হয় সেই ব্রত উদ্‌যাপনের প্রাণোচ্ছল কাজের সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গীযোগ।

কাজেই তরুণ সাইবেরিয়ানের দাবী সত্য বলে প্রমাণিত হল; বুঝতেই পারেন এতে কি পরিমাণে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। রাশিয়ার কর্মক্লিষ্ট চাষী যারা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রাখবার জন্য ফসলের জমি বাড়াবার চেষ্টা করেছিল—তাদের যদি বলা যায় যে তারা প্রতি পাঁচ একরে চার একর জমি নষ্ট করে চলেছে তবে তার ফলটা কি হয় একবার ভেবে দেখুন তো!

অত কথা বাদ দিয়ে আমাদের দেশের চাষীকেও ঐ কথা বলার চেষ্টা করে দেখুন না। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আমাদের জমি থেকে চাষীরা যে ফসল পায় তার পাঁচগুণ ফসল সেখান থেকে পাওয়া সম্ভব?

হয়ত সম্ভব। রাশিয়ার গমের জমি অনেকটা আমাদের মত। আর ইয়েক্রেমভের পদ্ধতি অতিদ্রুত সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল আবাদী জমির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। যৌথ কৃষির পাঠাগারের বই পড়ে যেটুকু শেখা সম্ভব তার বেশী বিশেষ শিক্ষা যার ছিল না সেই তরুণ চাষী কৃষির ইতিহাসের একটি বৃহত্তম অগ্রগতির জনক। তার চেয়েও বড় কথা—তার আবিষ্কার সমগ্র রুশ-কৃষকেরা অতি দ্রুত কাজে লাগিয়েছে। জনসাধারণ তাদের নব বিজ্ঞানের বিপুল শক্তির প্রমাণ হিসাবে একে অভিনন্দন জানিয়েছে।

সংক্ষেপে, ইয়েক্রেমভ পদ্ধতিটি এই রকম:—প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ চাষের জমিতে সূর্যরশ্মি কি ভাবে পড়ে সেই অনুসারে বীজ লাগানোই হল এর মূল কথা। পুরানো পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক ঋতুতে সূর্যের গতিপথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষকেরাই এর পথ বাৎলে দেন। আবার ইয়েক্রেমভের আবিষ্কারের ফলে গমের ফসল যে রকম বিপুলভাবে বাড়বে তাতে সার ব্যবহার না করলে

জমি নিঃস্ব হয়ে যাবে। সূর্যকে ফসল ফলানোর কাজে লাগানোর এই হল সত্যকার রহস্য। আগে শস্যক্ষেত্রে সার দেওয়ার খরচ পোষাতো না। এখন পোষায় কারণ ইয়েক্রেমভ পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি ও মেহনতের দিক দিয়ে সামান্য বাড়তি খরচে প্রতি একরে পাঁচগুণ বেশী গম ফলে। গত বছর সোভিয়েটের আবাদী জমিতে ৪০ লক্ষ টন সার ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য শস্য সম্পর্কে ইয়েক্রেমভের আবিষ্কার প্রয়োগ করার জন্য "বৈজ্ঞানিক বপন প্রতিষ্ঠান" স্থাপন করা হয়েছে।

আলেক্সাই স্টাখানভের অপেক্ষাকৃত বেশী সুপরিচিত কাজের সঙ্গে ইয়েক্রেমভের আবিষ্কারের তুলনা চলে। এই সোভিয়েট কয়লা খনির মজুর প্রতি 'সিফ্‌টে' তার কয়লার ভাগ ১০ টন থেকে ২৫ টনে তোলবার এক উপায় বের করে। দক্ষ জার্মান রুর খনি মজুরেরাও এত কয়লা তুলতে পারে না। পরে স্টাখানভ 'সিফ্‌ট' পিছু তার কয়লার ভাগকে ১০২ টনে ঠেলে তোলে। এ এক সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও দুনিয়ার উচ্চতম হার। স্টাখানভের আবিষ্কার প্রয়োগ করে সম্প্রতি আর একজন সোভিয়েট খনিমজুর এক সিফ্‌টে ৫৩৬ টন তুলেছে। এ এক তাজ্জব ব্যাপার! ইয়েক্রেমভের গমের ফসলের মত এই কয়লা তোলার অঙ্কও অবিশ্বাস্য বোধ হয়। কিন্তু বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এ কথার যাথার্থ মিলিয়ে দেখেছেন। সোভিয়েটের অন্যান্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। যেমন এক বর্গ মিটার আয়তনের হাপর পিছু ১২ টন ইস্পাত ঢালাই করা। আর এই সব উৎপাদন বৃদ্ধি হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে হয় না; এতে অদ্ভুত শক্তি বা ধৈর্যের প্রয়োজন হয় না। এ হচ্ছে মজুরদের চিন্তা, বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও কর্মোদ্যোগের ফল। স্বয়ং স্টাখানভের ভাষায়—"এর ফলে আমরা

আমাদের শক্তি ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারি আর আমাদের ফলপ্রসূ চিন্তা ধারণাগুলিকে বেশ খেলাতে পারি। এর অর্থ যন্ত্রের উপর মানুষের জয়। প্রত্যেক মজুর যে এঞ্জিনীয়র বা বিশেষজ্ঞের সমান মাত্রার সাংস্কৃতিক ও যান্ত্রিক জ্ঞান আয়ত্ত করতে উদ্যত হয়েছে—এটি তারই সংকেতচিহ্ন"।

ইয়েফ্রেমভের সাকরেদ আর একজন রুশ কৃষিবিদ র‍্যাকিটিন ঘন বপনের উপযোগী এক নূতন ধরনের গম বের করেছেন। এর প্রত্যেক শিষ গমে দুটি বেশী দানা থাকে। কিন্তু তার মানে দাঁড়ায় প্রতি একরে ৪ কোটি অর্থাৎ ৪০ বুশেল বেশী দানা। অর্থাৎ পুরানো পদ্ধতি অনুযায়ী এই বাড়তি ফসলটাই বেশ ভালো মোট ফসলের সমান!

বিখ্যাত ইউক্রেনিয়ান কৃষিবিদ টি, ডি, লাইসেংকো কৃষিবিজ্ঞার ক্ষেত্রে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন। এর নাম 'ইয়ারোভাইজেশন।' এই ব্যাপারটি খুবই জটিল কিন্তু আমার আপনার পক্ষে সহজ ভাষায় এর মানে হল এই—লাইসেংকো বীজ লাগাবার আগে সেগুলির উপর এমন কতগুলি প্রক্রিয়া চালানোর উপায় বার করেছেন যাতে মাটিতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি অতিদ্রুত বেড়ে ওঠে। ইয়ারোভাইজেশনের ফলে মার্কিন মুল্লুকের চেয়ে অনেক বেশী উত্তরেও (Farther North) তুলার মত শস্য জন্মানো যায়। যেখানে আগেই তুষারপাত হয় সেখানে এর সাহায্যে অনেক শস্য দ্রুত পেকে ওঠে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সব কোণ থেকে চাষীরা হাজারে হাজারে এসেছে লাইসেংকোর পদ্ধতি আয়ত্ত করতে। এই বৈজ্ঞানিক দেখতেও চাষীর মত। যদিও তিনি বিশ্ববিখ্যাত তবু তাঁর পোষাক

চাষীদের মতই। সারা বছর তিনি চাষী স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘোরেন, গবেষণা করেন, তাদের শেখান কেমন করে বীজগুলির পরে 'ইয়ারোভাইজেশন' প্রক্রিয়া করতে হয় আর জনসাধারণের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করেন। পাঁচ কোটি একরেরো বেশী ফসলের জমিতে এখন এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত বীজ লাগানো হয়। প্রতি একরে বাড়তি ফসলের পরিমাণ ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ মোট ৫০০ কোটি পাউণ্ড। এই উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্যই সোভিয়েট ইউনিয়ন সমস্ত ইউক্রেনের ফসলের জমি নাৎসী বাহিনীর হস্তগত হলেও খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখতে পেরেছিল। প্রধান খাদ্য উৎপাদনের জমিগুলি হারানো দূরে থাকুক সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৪১এর চেয়ে ১৯৪২এ পঞ্চাশ লক্ষ একর বেশী জমি চাষ করেছিল। এর অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞানের সাহায্যে রূপান্তরিত নূতন কৃষি অঞ্চলে।

বাইরের বৈজ্ঞানিকরা যাকে পৃথিবীর বৃহত্তম বৃক্ষজনন কেন্দ্র বলে নাম দিয়েছেন তারই অধ্যক্ষ হয়েছেন লাইসেংকো। কিন্তু রুশদের কাছে তাঁর কদর এই জন্য নয়। তাদের কাছে তাঁর সম্মানের কারণ এই যে তিনি কৃষিজীবী ও সমস্ত দেশের কল্যাণের জন্য প্রত্যেক নূতন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে চাষের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে অবিশ্রাম পরিশ্রম করেন।

বলা বাহুল্য ইয়েফ্রেমভ, র‍্যাকিটিন, লাইসেংকো ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদদের এই কাজ সমস্ত বীজ ও অন্যান্য শস্য সম্পর্কেও প্রযুক্ত হচ্ছে। একর পিছু ২০০ বুশেলের কথা শুনে আমাদের হেসে কোন লাভ নেই। গমের ঐ পরিমাণ ফসল একটি বাস্তব সত্য। খুব সম্ভবত দু বছরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরাট গমের জমি থেকে গড়ে অন্তত এর অর্ধেক হারে ফসল পাওয়া যাবে।

পৃথিবীতে এত ফসলের কথা কেউ কখনো শোনেনি। দুনিয়ার গমের

বাজারে এর ফলাফল কি হবে? দর কি একেবারে পড়ে যাবে? গম বিনিময় কেন্দ্র কি লেনদেন বন্ধ করবে?

ইয়েফ্রেমভ যখন গবেষণা করছিল তখন এ সব কথা সে ভাবেনি। এমন কি এখনও এ সব নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। সোভিয়েট বিজ্ঞানে 'গমের বাজার', 'গমের দর' বা 'গমের ব্যবসা' এ সব ব্যাপার নেই।

ইয়েফ্রেমভের উদ্দেশ্য তবে কি ছিল? উদ্দেশ্য ছিল খুবই সোজা। সে চেয়েছিল বৃদ্ধ টিমিরিয়াজেভের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে অর্থাৎ প্রকৃতিকে মানুষের যুক্তি ও ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করাতে। সেদিক দিয়ে এই তরুণ কৃষক তার স্বপ্নেরো অতীত সাফল্য লাভ করল। সে সূর্যকে এমনভাবে চাষীর কাজে লাগাল যা কেউ কখনো ভাবতেও পারে নি। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে এমন স্পষ্ট, সরল বিজ্ঞানের সাহায্যে সে সূর্যকে মানুষের স্বপক্ষে টেনে নিয়ে এল!

ইয়েফ্রেমভের উদ্দেশ্যও ছিল স্পষ্ট। গবেষণা আরম্ভ হওয়ার আগেই তার যৌথ কৃষিক্ষেত্রের চাষীরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল সে কথা। সেটি হল; কম মেহনতে বেশী গম ফলানো—মানুষের পেটের জন্য বেশী খাদ্য আর কম খাটুনি—সবলতর মানুষ গড়া ও চাষীর পক্ষে জীবনকে ভালো করে উপভোগ করার জন্য বেশী সময়। আপনাদের কি ব্যাপারটা জটিল বোধ হচ্ছে?

মৃত আইভান মিচুরিন ছিলেন আর একজন সোভিয়েট কৃষিবিদ যাঁর অগ্রচিন্তা আজ লক্ষ লক্ষ চাষীর কাজে লাগছে। তাঁর এক কোটি বিশেষ ফলের গাছ থেকে সাধারণ ধরনের গাছের দ্বিগুণ ফল পাওয়া যাচ্ছে। মিচুরিনের প্রিয় কথা ছিল: "প্রকৃতির কাছ থেকে কোন দাক্ষিণ্য আমরা আশা করতে পারি না: আমাদের কাজ হচ্ছে তা আদায় করা।" আর সোভিয়েট চাষীরা সেই আদায়ই করছে। অধ্যাপক সিট্‌সিন এক ধরনের

বারোমেসে গম বার করেছেন যা এরিমধ্যে একর পিছু ৩০ বুশেল ফসল ফলাচ্ছে; প্রকৃতির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এই 'দাক্ষিণ্য' থেকে বোঝা যায় যে শীঘ্রই বছরে বছরে বীজ না লাগিয়ে ফি বছর আপেলের মতই গমের ফসল পাওয়া যেতে পারে।

রাশিয়ার নরনারী ও শিশুর প্রাত্যহিক জীবন বিজ্ঞান কি ভাবে বদলে ফেলেছে সে সম্পর্কে একটি কথা বলা যায়। 'যৌগ ক্ষেত্র', 'ঐকত্রিকতার' বিরুদ্ধে চাষীর সংগ্রাম প্রভৃতি নিয়ে নানা কথা লেখা হয়েছে। রাজনীতিবিদেরা আমাদের বলেন যে আমাদের দেশে ও সব ব্যবস্থা চলবে না। নাম শুনলে ভড়কে যেতে হয় যে ব্যবস্থার—সেটি আসলে কি? ব্যবস্থাটি খুবই সোজা। কোনরকমে একটি পরিবার জীবিকা সংস্থান করতে পারে এ রকম হাজারটি ছোট ছোট ক্ষেতের জায়গায় সমস্ত ক্ষেতগুলিকে একত্র করা হয়। যন্ত্রপাতিও এক করা হয়। ওটা খানিকটা আমাদের দেশের পুরানো 'মৌমাছি' ব্যবস্থার মত যাতে কোন চাষী অসুস্থ হলে পড়শীরা একজোট হয়ে বীজ লাগাতো বা শস্যকণা ঝাড়ত। সোভিয়েটের কৃষিক্ষেত্রে শুধু 'মৌমাছিরা' সারা বছরই থাকে। সমস্ত ক্ষেতে বীজ লাগানো, ঝাড়া, হাল দেওয়া, গরু বলদের তদারক করা বা অন্যান্য কাজে সবাই হাত লাগায়।

যৌগ কৃষির চাষীরা আধুনিক বাড়ীতে বাস করে। সন্ধ্যাবেলা খাবার আগে তারা কাজ সারে—তারপর সিনেমা, সাঁতারের জায়গা, ক্লাব বা থিয়েটারে যায়। বিখ্যাত অভিনয় দল, গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রীরা যৌগ কৃষি থিয়েটারে আসেন। এদের নিজস্ব হাসপাতাল, ঔষধালয়, মোটর রাখার ঘর আছে—আর আছে ছোটদের জন্য পাঠাগার ও শিশুসদন। তরুণ চাষী বিবাহেচ্ছু স্ত্রী-পুরুষকে নূতন বাড়ী দেওয়া হয় যেখানে তারা থাকতে ও সংসার পাততে পারে।

যৌথ কৃষি হচ্ছে শুধু সাধারণ কল্যাণের জন্য সমস্ত চাষীর একত্র চাষের ব্যবস্থা। বিজ্ঞান রুশ কৃষি জীবনে বিপ্লব এনেছে। চাষী ও শহুরে লোকের তফাৎ এর ফলে দূর হয়েছে। অজ্ঞ, কর্মক্লিষ্ট, ভীরু দরিদ্র রুশ চাষী চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়েছে আর তার জায়গায় দেখা দিয়েছে ইয়েফ্রেমভের মত চাষী।

বিজ্ঞানের গোপন হাতিয়ারে সজ্জিত চাষী! চাষী যারা মানুষের কাজের সাথী হিসাবে সূর্যকেও পেতে শিখেছে যাতে গ্রামাঞ্চলে আবার মুক্ত আনন্দময় জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়।

গোপন হাতিয়ার সৃষ্টি

নূতন রুশ সরকারের নেতারা প্রথমেই এমন হারে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিকল্পনা করলেন যা আজগুবী মনে হত। ১৯১৮ সালে লেনিন স্বয়ং এই পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনার নথিপত্র মনুষ্যজাতির অগ্রগতির একটা স্মারকচিহ্ন হিসাবে বিশ্ব ইতিহাসে ধার্য হবে। এর নাম হল "বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কার্যের পরিকল্পনার খসড়া।" 'একাডেমী অফ সায়েন্সেস' অর্থাৎ বিজ্ঞান পরিষদের হাতে এটি দেওয়া হল। প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়ন বিজ্ঞানের লক্ষ্যের দিকে দ্রুততম গতিতে অগ্রসর হল। পুঁজি বা ধর্ম বা কৃষি সম্পর্কে নীতির পরিবর্তন হোক না হোক বিজ্ঞান সম্পর্কিত নীতি ছিল অবিচলিত।

অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকরা এই নীতিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। তবু সে আক্রমণও সর্ববাদীসম্মত ছিল না। তার কারণ এই ঃ—

বিশ্বযুদ্ধেরো কয়েক বছর আগে থেকেই সমস্ত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহল নিজস্ব 'সংকটে'র সম্মুখীন হয়েছিল। শিল্পী ও সংগীতবিদদের সৃষ্টির মত বৈজ্ঞানিক গবেষণাও শুধু আপন আনুগত্যের তাগিদেই চলে—এই সনাতন ধারণা দ্রুত নষ্ট হচ্ছিল। শিল্পগুলি শ্রেষ্ঠ তরুণ বৈজ্ঞানিকদের টেনে নিচ্ছিল। এই যুবকেরা দেখলেন যে অনেক সময় তাঁদের আবিষ্কারগুলি চেপে রাখা হয়। শীঘ্রই দাবী উঠল যে বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা ও অন্যান্য দেশে সরকার সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভার নিক।

এই প্রস্তাবের তীব্র বিরুদ্ধতা করলেন অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরা ও বড় বড় শিল্পগুলি। তাই হার মানতে হল। সরকার যখন সত্যসত্যই জাতীয় গবেষণা পরিষদ স্থাপন করল তখন তার কাজ প্রধানত চলল ব্যক্তিগত শিল্পগুলির স্বার্থে। সর্বদাই টাকার অভাব ও ঔদাসীন্যের চাপে এর কাজ হোত বিড়ম্বিত। সোজা কথায়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই নীতি চলল যে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ মুনাফা যাবে বড় বড় শিল্পপতিদের পকেটে আর যদি কোনো গবেষণার ফলে লাভের অঙ্ক খাটো হবার উপক্রম হয় তবে তা বন্ধ করতে হবে।

আমেরিকায় এই পন্থার জঘন্যতম উদাহরণ সম্প্রতি দেখা গেছে। এ্যাটর্নী জেনারেল দেখিয়েছেন যে জনকয়েক শিল্পপতি আপন মুনাফা বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি থামাতে ও স্বদেশের জাতীয় প্রতিরোধব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ করতে পিছপাও হয়নি। জনসাধারণ এ সব প্রকাশিত হওয়ায় চমকে গিয়েছিল কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কাছে এ সব হল পুরোনো কথা। গত পঁচিশ বছরে টাকার বিনিময়ে বিজ্ঞানকে বারবার বেচাকেনা, প্রয়োগ বা বরবাদ করা হয়েছে।

এই সময়ে রুশদেশে নূতন এক ধরনের বিজ্ঞানের আবির্ভাব হচ্ছিল। সোভিয়েটের প্রথম আমলের দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালা হল আশ্চর্য এক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায়। যে পরিকল্পনা সর্বত্রই সেদিন সমালোচনা ও পরিহাসের উদ্রেক করেছিল সেটি এই :—

প্রথমত রুশ বিজ্ঞান পরিষদ পক্কশ্মশ্রুদের সমিতি থেকে রূপান্তরিত হল ১৮ কোটি মানুষের কল্যাণের জন্য গবেষণা পরিচালনার কেন্দ্রে। দ্বিতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানের ছাত্র ভর্তি করা হল তখনই যখন তারা বিশেষ কোন পারদর্শিতা দেখাতে পারত; কোন মাইনে নেওয়া হত না; পড়া যতদিন চলত ছাত্রদেরই খরচ দেওয়া হোত।

তৃতীয়ত বিজ্ঞানের ছাত্রদের কিছুটা সময় শিল্পে বা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে হোত। চতুর্থত কয়েকটি গবেষণাকেন্দ্রের জায়গার পরিকল্পনা দাবী জানালো "কারখানা ও ক্ষেত পিছু এক গবেষণাগারের।" পঞ্চমত গবেষণার সমস্যাগুলি উঠত শিল্প, কৃষি ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন থেকে।

ভাবুন একবার গুরুগম্ভীর বৈজ্ঞানিকদের কয়লাখনিতে বা ফসল ক্ষেতে কাজ করতে পাঠানোর চেষ্টা হচ্ছে! কল্পনা করুন আপনার হাতে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দিচ্ছে আমলা বা অজ্ঞ চাষী মজুরেরা!

বিজ্ঞানী মহলের লোকেরা সোভিয়েট পরিকল্পনা দেখেতো চটে আগুন। তারপর তারা কিছুটা ঠাণ্ডা হল। শেষে শুরু হল তাদের অবাক হবার পালা।

আসলে লেনিনের প্রস্তাব সাংঘাতিক রকম বৈপ্লবিক ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের উন্নততর সমাজ সম্ভব করার জন্য মুষ্টিমেয় লোকের কবল থেকে বিজ্ঞানকে উদ্ধার করে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতে তার মর্ম গ্রহণ করতে পারে বা তাকে ব্যবহার করতে পারে তার চেষ্টা করতে।

জানেন কি প্রথম কে এই 'সাম্যবাদী' প্রস্তাবের কথা ভেবেছিল? ৩০০ বছর আগে বিখ্যাত ইংরাজ স্থপতি ক্রিস্টোফার রেন!

পৃথিবীর প্রথম বিরাট বৈজ্ঞানিক সংগঠন রয়াল সোশাইটি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার সময় রেন বলেছিলেন "এই নশ্বর জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা লাঘব আর প্রত্যেকের মেহনত অনুযায়ী সম্পদ বিভাগ করার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনই হল শান্তিপূর্ণ গভর্নমেণ্ট স্থাপনের পথ।" সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থাপিত রয়াল সোশাইটির এই হল মূল মন্ত্র। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সোশাইটির সভ্যরা সোভিয়েট কি চায় ধরতে পারলেন না।

এখন যখন হিটলারী বর্বরেরা আশ্চর্য চমৎকার রেন গির্জাগুলিকে একের পর এক ধ্বংস করে ফেলেছে তখন বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা ও অন্যান্য মিত্রশক্তিপুঞ্জের বৈজ্ঞানিকেরা অবশেষে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে হাত মেলাতে যাচ্ছেন।

যে বিশ বছর তাঁরা দূরে সরে ছিলেন সেই সময়ে কি ঘটেছে? তাজ্জব সব ব্যাপার ঘটেছে কিন্তু কোনোটিই তত আশ্চর্য নয় যেমন হচ্ছে :—

কয়লা বশ করার কাহিনী

১৯০০ সালেই রাশিয়ার রাজনৈতিক নেতা লেনিন নূতন দুনিয়া গড়ার কাজে কি ভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা যায় এই নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মূল সমস্যা হচ্ছে জ্বালানি বা যান্ত্রিক শক্তির। যদি পৃথিবীময় যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবেই অবশেষে মানুষ তার প্রকৃতিকে বশ করার সাধনা, "মানুষের ইচ্ছার কাছে প্রকৃতির নতিস্বীকার" সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে।

কাজেই লেনিন মনোনিবেশ করলেন বিপুলভাবে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করার প্রশ্নে। এ বিষয়ে তিনি লিখলেনও যথেষ্ট। একদিন তিনি এক চমৎকার প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

বহুদিন আগে দুই বিখ্যাত রাসায়নিক—রুশ মেণ্ডেলিভ ও ইংরাজ র‍্যামসে এই ব্যাপার নিয়ে প্রথম কাজ চালান। তাঁরা মাটি খুঁড়ে কয়লা তোলার ব্যবস্থা বন্ধ করার কথা তুলেছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন মাইলখানিক মাটির নীচে থেকে কয়লা কেটে, সেটাকে তুলে রেল বা জলপথে তাকে দূর দেশে পাঠিয়ে তারপর শিল্প বা গৃহস্থের কাজের জন্য চুল্লীতে ফেলে তার থেকে গ্যাস বানানো কত হাস্যকর—জ্বালানি হিসাবেও কয়লার ব্যবহার কত বোকামী। তাঁরা দেখালেন কি ভাবে অল্প কয়লা যদি খনির মধ্যে জ্বালানো যায় তবে তা থেকে আশেপাশের বিপুল পরিমাণ কয়লা গরম হতে পারে ও তার ফলে প্রচুর পরিমাণ কয়লার গ্যাস তৈরী

হওয়া সম্ভব। এই গ্যাস তখন পাইপে করে যেখানে ইচ্ছা চালান দেওয়া যেতে পারে—রেলপথ বা জাহাজের সাহায্যে কয়লা সরবরাহ করার প্রয়োজন হয় না। কয়লা স্থানান্তরিত হবার বা তাকে ছোঁয়ারও দরকার নেই।

এঞ্জিনীয়ররা যে এই ব্যবস্থা যা থেকে রুশ ও ইংরাজ খনির মালিকরা প্রচণ্ড মুনাফা করতে পারত তাকে ভালো করে ভেবেও দেখেনি — তা অবিশ্বাস্য বোধ হয়। তারা বলেছিল এ অসম্ভব। রুশ বিপ্লবের জনক লেনিনই হলেন প্রথম মানুষ যিনি এই প্রস্তাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। ১৯১৩ সালের ৪ঠা মের 'প্রাভদায়' তিনি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

তিনি স্পষ্টই এ কথা বুঝলেন যে পাতালপুরীতে বন্দী কয়লা হচ্ছে মানুষের বিরুদ্ধ এক প্রাকৃতিক শক্তি। কয়লা খুঁড়ে, তুলে তাকে চালান দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, বিপদজনক ও ব্যয়সাধ্য। লেনিন দেখলেন যে মেণ্ডেলিভ ও র‍্যামসের পথই হল কয়লাকে আয়ত্ত করে তাকে মানুষের ইচ্ছার অধীন করার পথ।

আরো দুটি সম্ভাবনার কথাও লেনিন আগেই বুঝেছিলেন। প্রথমত মাটির তলে অপরিমিতভাবে গ্যাস উৎপন্ন করলে তার ব্যবহারের জন্য এক নূতন ধরনের এঞ্জিন—অতি উষ্ণ গ্যাস টারবাইনের প্রয়োজন। (রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে ঐ এঞ্জিন এখন ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু যুদ্ধসংক্রান্ত গোপনীয় বিষয় বলে আমরা এখানে তার আলোচনা করতে পারলাম না।) দ্বিতীয়ত, এই গ্যাস টারবাইনের সাহায্যে প্রমাণ খরচার পাঁচ ভাগের এক ভাগ খরচায় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব।

কল্পনা করুন বিপ্লবী লেনিন, য়ুরোপের সর্বত্র পুলিশের তাড়ায়

যিনি দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতেন তাঁর মাথায় রয়েছে এমন পরিকল্পনা যা য়ুরোপের শিল্পপতিদের নূতন এক শিল্প ও প্রভূত ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারত! তিনি কাগজপত্রেও সে পরিকল্পনার কথা লিখে গেছেন। কোনো পুঁজিপতি কিন্তু নজর দেয়নি এদিকে। রুশ বিপ্লব যখন এল তখন লেনিন রাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে কয়লা জ্বালানোর পরিকল্পনাটি তিনি স্টালিনকে বুঝিয়ে দিলেন।

স্টালিন পরিকল্পনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব করে দেখলেন। বিশেষজ্ঞরা কিন্তু নিরাশার কথাই বললেন। এঞ্জিনীয়ররা মাথা নাড়লেন। চাষী ইয়েফ্রেমভ কি ভাবে সমস্ত কৃষিবিদদের ভুল প্রতিপন্ন করেছিলেন মনে আছে তো? স্টালিন বৈজ্ঞানিকদের স্মরণ করিয়া দিলেন যে নূতন বিজ্ঞানের অধিকার সমস্ত জনসাধারণের। প্রত্যেকটি প্রস্তাব হাতেনাতে বিচার করে দেখতে হবে। সবশেষে হুকুম হল কয়লা খনিতে আগুন জ্বালানোর পরীক্ষা শুরু করার।

গবেষণার ফল তাঁদের চরমতম আশাকেও ছাপিয়ে গেল। ১৯৩৮ সালে বিরাট গোরলোভ্কা খনিতে আগুন দেওয়া হল। এর পরে হল আরো অনেকগুলিতে। এদিককার কাজ দ্রুত ফেঁপে উঠল। রাশিয়ার পাতালপুরীর কয়লাকে গ্যাসে পরিণত করার ব্যাপারটা এত বিপুলভাবে হচ্ছে যে এটিকে একটি আলাদা শিল্পবিভাগ বলে গণ্য করা হচ্ছে।

কিভাবে এটিতে কাজ চলে? খুবই সোজা এর উত্তর। একটি খনিতে আগুন দিতে হলে কয়লার স্তর পর্যন্ত পৌঁছয় এমন দুটি চোঙার দরকার আর একটি গ্যালারী যা সোজাসুজি এ দুটিকে যোগ করে। তারপর কয়লায় আগুন দেওয়া হয়। উপরে মস্ত বড় বড় পাখার হাওয়া একটি চোঙার মধ্যে দিয়ে নীচে পাঠানো হয়।

বাতাসের পরিমাণের পরেই নির্ভর করে কতটা কয়লা পুড়বে ও কতটা তাপ উৎপন্ন হবে তার পরিমাণ। তাপ কি রকম হয় ? কল্পনা করুন একটি চুল্লীতে প্রতি মিনিটে শত শত টন কয়লা পুড়ছে। এই প্রচণ্ড তাপের ফলে সমস্ত খনিটি একটি বিপুল পরিমাণ গ্যাস উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় চোঙাটি দিয়ে প্রচণ্ডভাবে যে গ্যাস বেরোতে থাকে মস্ত বড় বড় পাইপে তা নানা দিকে চালান দেওয়া হয়।

এতে একজনও খনিমজুরের দরকার হয় না। কয়েকজন লাগে পাখা চালানোর জন্য। বিশেষজ্ঞরা পরিমাণজ্ঞাপক যন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখেন—হাজার হাজার টন উৎপাদনের খবরদারি করেন।

গোর্‌লোভ্‌কার সংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, ঠিক খনিতে যেভাবে কাজ চলে সেভাবে করলে শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ কয়লা উপরে তোলা যায় কিন্তু এইভাবে আগুন লাগাবার পদ্ধতিতে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কয়লা গ্যাস হিসাবে উপরে ওঠে। যে কয়লা ব্যবহারে আসত না তা এ ক্ষেত্রে কাজে আসে। আগুন খনির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকবেই। সব থেকে খারাপ কয়লা থেকেও চমৎকার গ্যাস হয়।

গ্যাস ব্যবহার হয় কি ভাবে ? তিন উপায়ে। শিল্পের বড় বড় চুল্লীতে অবশ্যই গ্যাস জ্বালানো হয়। তারপর নূতন অতি-তাপমান টারবাইনে ব্যবহার হয় যার সঙ্গে বিদ্যুৎ-জনন যন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। জল বা বাষ্প ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাইতে এতে খরচ পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয় (তার চাইতেও কম)—লেনিনের এই হিসাব এই বিদ্যুৎ-জনন যন্ত্রগুলি সত্য বলে প্রমাণ করেছে। রুশ শিল্পের অগ্রগতির পক্ষে এর তাৎপর্য কি সে বিচার আপনার কল্পনার পরেই ছেড়ে দেওয়া গেল।

সবশেষে এই জ্বলন্ত খনিগুলিকে আর এক এমন কাজে লাগানো হয় যা কেউ ভাবতেও পারেনি। এগুলিকে বিরাট স্বয়ংচালিত রাসায়নিক কারখানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, জল ও বাতাস যদি এই পাতালপুরীতে ঢোকানো যায় তবে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন এই চারটি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সেখানে একত্র সমাবেশ হয়। এর থেকে অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। রুশেরা এখন তাদের নূতন রাসায়নিক কলকারখানা সম্পর্কে বিশেষ সাড়াশব্দ করছে না। কিন্তু যে কোনো এঞ্জিনীয়র বলতে পারে যে যদি এমন রাসায়নিক কারখানা থাকে যা বানাতে খরচ লাগে না, যাতে প্রায় কোনো কলকব্জারই প্রয়োজন নেই, যার-জন্য জাহাজে করে কাঁচামাল আমদানীর দরকার হয় না, তাপ ও যান্ত্রিক শক্তি যাতে অমনি মেলে আর শুধু হাতল ঘুরিয়ে যা বাড়িয়ে ফেলা যায় তার সম্ভাবনা কতটা! যেখানেই কয়লার স্তর আছে সেখানেই অতি দ্রুত এই কারখানা বসানো যায়। এর থেকে যুদ্ধের পরে রাসায়নিক শিল্পের প্রচণ্ড অগ্রগতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কিন্তু গোর্‌লোভ্‌কার যে সব খনিমজুরদের চাকরী গেল তাদের কি হল? গোড়া থেকেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্যও ছিল তাই—অর্থাৎ খনির নীচের কাজ বন্ধ করা। বরাবরই সে কাজে মানুষের শক্তির অপচয় ঘটেছে। সে কাজ বিপদজনক ও বহু মানুষের জীবনপাত করেই তা সম্ভব হয়ে এসেছে। সোভিয়েট খনি থেকে যাদের সরানো হল তখনই তাদের অন্যত্র কাজ দেওয়া হল। মাটির নীচের কয়লা পুড়িয়ে যে সস্তা যান্ত্রিক শক্তি ও রাসায়নিক সামগ্রী উৎপন্ন হল তার দ্বারা সোভিয়েট শিল্প এত ভীষণভাবে ফেঁপে উঠল যে খনি মজুরদের পুনর্নিয়োগের পরও আরো কাজের লোকের প্রয়োজন রইল!

বিজ্ঞানের কাজ নয় মুনাফা বাড়ানো।

তার কাজ প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ মানানো। মানুষের অভাব মেটানো আর তাদের মেহনতের বোঝা কমানো!

হয়ত আমাদের এখানে খানিকটা রাশ টানা উচিত। একটা ব্যাপার ঘুলিয়ে ফেললে চলবে না। চট করে এ সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে বিজ্ঞান গণতান্ত্রিক 'ধনবাদী' দেশগুলিতে মানুষের জন্য কিছু করেনি।

ঠিক তার উল্টো! গত পঞ্চাশ বছরে ধনবাদই বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার প্রচণ্ড অগ্রগতি সম্ভব করেছে। ধনবাদের আগে বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন কৌতূহলই ছিল না। শিল্পব্যবস্থাই বিজ্ঞানের সামনে পথ খুলে দিল তাই বিজ্ঞান দ্রুত এগিয়ে গেল,—দুনিয়াকে নূতন করে গড়ল।

আসলে বিজ্ঞান ও ধনবাদ একত্রে এত দ্রুত অগ্রসর হল যে কিছু লোক সাফল্যের নেশায় মাতাল হয়ে উঠল—দুনিয়ার কাছে ঘোষণা করল: "বড় বড় শিল্পগুলি যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে তাকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অসম্ভব। অন্যরা গরীব থাকতে যদি বৈজ্ঞানিক-দের বড় লোক হবার পথ না থাকে তবে তাদের কাজ করবার কোনো অর্থই থাকে না। মস্তিষ্কের মূল্য দিতে হয় টাকার অঙ্কে।" এই হল পয়লা ভুল।

হয়ত আপনারা সোভিয়েট পদার্থবিদ কাপিট্‌সার নাম শুনেছেন। হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের ঠিক পরেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকে বিজ্ঞান জগতের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মান ফ্যারাডে মেডাল প্রদান করেন। দু দিক থেকে এই সম্মান প্রদান আশ্চর্য। প্রথমতঃ এর দ্বারা এই তরুণ সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক জগতের অমর প্রতিভাদের

মধ্যে আসন পেলেন। দ্বিতীয়ত এক সময়ে ডাঃ কাপিট্সাকে ইংলণ্ডে থাকবার জন্য বহু টাকা দেবার প্রস্তাব করা হয়। তখন সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের কাজে তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁর গবেষণা চালাবার জন্য ফিরে যান।

সেখানে তিনি নেপোলিয়নের সময়কার বিখ্যাত ফরাসী, সাদি কার্ণো যে বৈজ্ঞানিক সূত্র প্রবর্তন করেন তাই নিয়ে পড়াশুনো করেন। কার্ণোর জটিল অঙ্ক থেকেই যে বাষ্পীয় শক্তি শিল্পবিপ্লবের মূলে ছিল তার সম্ভাবনা বোঝা যায়। পরে ঐ সূত্র ধরেই এঞ্জিনীয়ররা পেট্রোল ও ডিসেল এঞ্জিন আবিষ্কার করেন যা থেকে পৃথিবীতে দেখা দিল মোটর যানবাহনের ব্যবস্থা ও এরোপ্লেন। কাজেই কার্ণোর সূত্রটিকে যে এক শাশ্বত সত্য বলে মনে করা হত এতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

কাপিট্সা এই সূত্রকে দিলেন উল্টে। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কিছুদূর পর্যন্ত এই সূত্র অভ্রান্ত। তিনি বুঝতে পারলেন যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অনেক দিকে ব্যাহত হচ্ছে কার্ণো সূত্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের প্রায় অন্ধবিশ্বাসের জন্য। কাপিট্সা এই খাঁটি যুক্তি দেখালেন যে বিজ্ঞানের পক্ষে কোনো কিছুতেই অত অসংশয়িত বিশ্বাস অনুচিত। অতীতকে পরিবর্তিত করবার চেষ্টা ও তাকে এগিয়ে নেবার পন্থানুসন্ধান থেকেই অগ্রগতির উদ্ভব।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো এক কথা আর নিজের মতের অভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠা করা আর এক কথা। কাপিট্সা দুটোই করলেন। অঙ্কের সাহায্যে কাগজে কলমে তাঁর ধারণা খাড়া করার পর তিনি সৃষ্টি করলেন এক ক্ষুদ্র যন্ত্র। এ হল এক টারবাইন প্রতি মিনিটে যেটি অতি দ্রুত

গতিতে ৬০,০০০ বার ঘোরে। অভূতপূর্ব ধরনের এই টারবাইন ঘণ্টায় ১,২০০ মাইল গতিতে বাতাস ছড়াতে পারে। মামুলী যন্ত্রের চেয়ে অনেক দ্রুত ও সস্তায় এর সাহায্যে ডাঃ কাপিট্সা তরল বাতাস ও পৃথিবীর শীতলতম পদার্থ তরল হিলিয়াম বানাতে পারেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই ছোট্ট টারবাইন একটি বৈজ্ঞানিক ক্রীড়াসামগ্রী মাত্র হয়ে রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুতভাবে শিল্পে এর প্রয়োগ আরম্ভ হল।

কাপিট্সা সেই বিরাট জ্বলন্ত কয়লা খনিগুলি থেকে নিলেন গ্যাস। তাঁর টারবাইনের সাহায্যে তিনি ঐ গ্যাসকে অতি শীতল তরল পদার্থে রূপান্তরিত করলেন। রাসায়নিকেরা দেখলেন যে এই তরল গ্যাসের সাহায্যে তাঁরা অনেক প্রক্রিয়া করতে পারেন। সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁরা সব থেকে ভালো মোটর চালাবার তেল, বিস্ফোরক পদার্থের রাসায়নিক উপাদান, কৃত্রিম রবার, প্লাষ্টিক ও অন্যান্য সামগ্রী বানাতে পারলেন। আর জ্বলন্ত কয়লাখনি থেকে পাওয়া গেল অপর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস।

এ সব ঘটল অদ্ভুত দ্রুত গতিতে। ডাঃ কাপিট্সা তাঁর গবেষণাগারের প্রথম আবিষ্কার ঘোষণা করার তিন বছরের মধ্যে তাঁরই পরিকল্পিত বিপুলায়তন যন্ত্র সোভিয়েট শিল্প ও লাল ফৌজের জন্য রাসায়নিক সামগ্রী যোগান দিতে লাগল। আমাদের দেশের এঞ্জিনীয়র, রাসায়নিক ও শিল্পপতিরা যাঁরা বোঝেন দুনিয়ার শিল্পজগতে কাপিট্সার কাজের প্রভাব কি প্রচণ্ড হতে পারে তাঁরাও বুঝতে পারেন না কয়েক পৃষ্ঠা অঙ্ক ও ছোট্ট একটা টারবাইন অত শীঘ্র কি করে বিপুল, নূতন শিল্পপ্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হতে পারে।

এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। ডাঃ কাপিট্সার আবিষ্কার হল অত্যন্ত জরুরী

এক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। সোভিয়েট ইউনিয়নে অবিলম্বে এটি সেই ভাবেই গৃহীত হল। আর ঐ দেশে বিজ্ঞান হল সমগ্র জারিত হাতিয়ার। কাজেই কাপিট্সার এই আশ্চর্য আবিষ্কার যা সমগ্র জাতির পক্ষে বিপুল কার্যকরী সুবিধার প্রতিশ্রুতি এনেছিল—তাকে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো হল, শিল্প ও কারখানায় প্রয়োগ করা হল। এক ঘণ্টা সময়ও নষ্ট করা হয়নি। যে ক্ষিপ্র গতিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাজে লাগানো হল তাতে আমাদের দেশে নব-আবিষ্কৃত সোনার খনি বা তেলের খনি নিয়ে যে রকম তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হয় তার কথা মনে পড়ে। কিন্তু 'কাপিট্সা টারবাইন' সমগ্র রুশ জাতির, বিশেষ করে তা যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট শিল্পের কাজে লাগে আর সোনা বা তেলের খনি আমাদের দেশে একটি লোক বা কোম্পানীর মুনাফা হঠাৎ ফাঁপিয়ে তোলে।

সম্প্রতি বেশ কিছু বই ও প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে গত দশ বছরে সোভিয়েট শিল্প কতটা বেড়ে উঠেছে। ব্যবসাসংক্রান্ত পত্রিকায় এই উন্নতির সমর্থক সংখ্যাও মেলে।

কিন্তু অঙ্ক হল নীরস ব্যাপার। যত সব হিসাব আর অঙ্কের তালিকা বেরিয়েছে তার থেকে একটি নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়েই রুশ শিল্পের আশ্চর্য অগ্রগতির কথা অনেক বেশী স্পষ্ট বোঝা যায়।

১৯২১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন ভীষণ যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল তখন একদল বৈজ্ঞানিক নীপার নদীর উপরে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য একটি বাঁধ তৈরীর পরিকল্পনা করেন। এই বাঁধ এত বিরাট যে কল্পনা করতে গেলেও চমক লাগে। এমন কি মার্কিনদের কাছেও পরিকল্পনাটি বিপুল বোধ হল। রুশদের তখন না ছিল কোন বড় বিদ্যুৎ সরবরাহের বাঁধ, না গগনস্পর্শী ইমারৎ, না সমস্ত দেশে এমন বিরাট কোন জিনিস যা নিয়ে গর্ব করা চলতে পারে।

কাজেই তাদের কাছে নীপারের বাঁধ ছিল স্বপ্নের সামিল। কিন্তু সেই স্বপ্নকে তারা বাস্তবে পরিণত করল। বাঁধ তৈরী হল—বিপুলভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হতে থাকল এর থেকে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশ এই বাঁধ সম্বন্ধে এত কথা শুনেছিল যে বহু লোক এ নিয়ে ঠাট্টা শুরু করল—বলল, এ হচ্ছে রাশিয়ার গাঁজাখুরী, ওদেশের মত পিছিয়ে পড়া জাতের পক্ষে এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অবান্তর। বিশ্বাস করা হত যে রুশেরা নীপার বাঁধের পূজা করে—পবিত্র মন্দির বলে মনে করে একে।

এই বিরাট বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়া হয়েছিল বহু পরিশ্রম ও মালমশলা খরচ করে। সমস্ত দেশ তখন ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। সোভিয়েটের মানুষ তাদের স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্য যে প্রাণপাত করতে পিছপাও হয়নি তারই প্রতীক এটি। এসত্ত্বেও সেখানকার মজুর ও লাল ফৌজের বিশেষজ্ঞেরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করল ঐ নীপার বাঁধটিকে। খবরের কাগজের হরফে যখন জানা গেল যে বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনীয়ারিং কীর্তি সোভিয়েটের নির্মম 'পোড়া মাটির' ব্রতপালনে ধূলিসাৎ হয়েছে তখন সমস্ত দুনিয়া অবাক হয়ে গেল। আশঙ্কা হল রাশিয়া বুঝি বা সর্বাঙ্গীন সর্বনাশের সম্মুখীন, তাই মরিয়া হয়ে স্টালিন বাঁধ ধ্বংসের এই হুকুম দিয়েছেন।

এই আঘাত যখন এল তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র যে তীব্র জ্বালা ও ক্রোধ দেখা গেল তার অত্যুক্তি অসম্ভব। কিন্তু সে জ্বালা জাতির দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকেই ইস্পাত কঠিন করে তুলল। সেই ক্রোধ নিযুক্ত হল আক্রমণকারীদের স্রোতের বিরুদ্ধে আর লাল ফৌজ চালালো লড়াই। সোভিয়েট শিল্প অবসন্ন হয়ে পড়ল না। পৃথিবীর আশঙ্কার উত্তরে রুশ এঞ্জিনীয়াররা শুধু বললেন "নাৎসীরা নিঃশেষ হলে আমরা

বাঁধের পুনঃসংস্কার করব। কিন্তু তাদের অগ্রগতির মুখে কোন মূল্যবান জিনিসই ফেলে রাখব না। যত মহামূল্য হোক না কেন এতটুকু দরকারী জিনিস তাদের হাতে পড়বে না।”

ক্রমে সমস্ত দুনিয়া (বিশেষ করে এঞ্জিনীয়র ও বিশেষজ্ঞরা) বুঝল কি ব্যাপার ঘটেছে। নীপারের বাঁধ তৈরী হবার পরের দশ বছরে নূতন বিজ্ঞানের সাহায্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন পোল্যাণ্ড থেকে মাঞ্চুরিয়া, সাইবেরিয়া থেকে গ্রীষ্মপ্রধান এশিয়া পর্যন্ত সব জায়গায় বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। বিপুল হলেও নীপার বাঁধের বিদ্যুতের অভাব মার্কিন মুল্লুকেও যা সম্ভব হয়নি এমন দ্রুতবেগে যে বিরাট বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা কাজে পরিণত হয়েছিল তার অনুপাতে এ ছিল একটি ভগ্নাংশ মাত্র।

দশ বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নের চেহারা বদলে গেল। এই পরিবর্তন সম্পর্কে নানা গুজব বাইরের জগতেও মাঝে মাঝে শোনা যেত। খুব কমই কিন্তু মানুষে এ সব কথা বিশ্বাস করত।

সোভিয়েট পরমাণুর লড়াই

পরমাণু চূর্ণ করার কথা আমরা সবাই পড়েছি—পরমাণুর উপাদান সম্পর্কে গবেষণার কথাও জানি। এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে কিন্তু চূর্ণীকৃত পরমাণু শুধু বৈজ্ঞানিক কাজেই নয়—হিটলারকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হচ্ছে। রুশেরা যুদ্ধের জন্য তাদের পরমাণুদের পর্যন্ত যোগাড় করে ফেলছে! আর পরমাণু চূর্ণ থেকে তৈরী আণবিক গোলা লাল ফৌজের অভিযানে সব থেকে কার্যকরী অস্ত্রগুলির অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্টালিনগ্রাদে যখন জার্মান ফৌজ সমূলে বিনষ্ট হচ্ছিল তখনকার হিটলার ও গোয়েবেলসের বক্তৃতা হয়ত আপনাদের মনে থাকতে পারে। জার্মান জাতির কাছে এই বক্তৃতায় পরাজয়ের কারণ দেখানো হত এই যে রুশেরা অসংখ্য ট্যাঙ্ক, কামান ও এরোপ্লেন এনে ফেলেছে। নাৎসী নেতারা তাদের বিস্ময় অকপটে প্রকাশ করেছিল। তাদের তিলমাত্র ধারণা ছিল না কোথা থেকে এই বিপুল জমানো সাজ সরঞ্জাম হাজির হল। আমেরিকা, কানাডা ও বৃটেন থেকে খুব কম পরিমাণই পাওয়া গিয়েছিল।

তখন পর্যন্ত আমাদের বলা হত—হিটলারও বিশ্বাস করত যে গোড়ার দিকের নাৎসী অভিযানে সোভিয়েটের বহু উৎপাদন কেন্দ্র হাতছাড়া হয়েছে। হঠাৎ কিন্তু লাল ফৌজ বিপুল পরিমাণ নূতন যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র হাজির করল। এগুলো তবে এলো কোথা থেকে? তার চেয়েও জরুরী কথা এগুলো বানালো কে?

আমাদের উৎপাদন বিশেষজ্ঞেরা এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন এই ভাবে। সোভিয়েট সরকার তার বিপুল দেশের প্রত্যেক নরনারী ও শিশুকে কাজে লাগিয়েছে আর অধিকৃত এলাকা থেকে বহু কারখানা উরাল পর্বতের নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে। এই দুটো জবাবই আংশিক সত্য। কিন্তু এই দুই-এরই মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ ছিল।

এখন এ কথা প্রকাশ করা চলে যে ২০০০ মাইল ব্যাপী ফ্রণ্টে সোভিয়েট অগ্রগতির পিছনে যে বিপুল পরিমাণ ভারী ভারী যন্ত্রসজ্জার বন্দোবস্ত ছিল সেগুলি সম্পূর্ণ নূতন উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে তৈরী হয়েছিল। এর মধ্যে কতগুলি ছিল ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষেত্রে একেবারে বৈপ্লবিক পন্থা। একদিকে যেমন লাল ফৌজের ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক, এরোপ্লেন অন্য দেশের চাইতে উৎকৃষ্টতর বলে প্রমাণিত হয়েছে তেমনই আবার সংখ্যার দিক থেকেও সোভিয়েট উৎপাদন আমাদের আগেকার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

চূর্ণীকৃত পরমাণু সোভিয়েটের এই নূতন ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা মস্ত অংশ গ্রহণ করেছে। ভেবে দেখুন পরমাণু বিস্ফোরণের সাহায্যে বড় বড় সোভিয়েট ফিল্ড কামান বা বাঘা বাঘা ট্যাঙ্ক তৈরী হচ্ছে।

নূতন উৎপাদন পদ্ধতির গোপন রহস্য হল ইলেকট্রন। পরমাণু চূর্ণ করলে গোলার মত এই ইলেকট্রন বিক্ষিপ্ত হয়। ৩,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ইলেকট্রনের ওজন হল এক আউন্স। এই অবিশ্বাস্য রকম ছোট পদার্থ থেকে যুদ্ধের কারখানার কাজ কেমন করে চলতে পারে?

যানবাহন ও পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের সর্বত্রই ইলেকট্রনের সাহায্য নেওয়া হয় প্রত্যেক দেশই ইলেকট্রনীয় কৌশল প্রয়োগ

করে। আমেরিকা, বৃটেন ও কানাডা যুদ্ধসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিতে ইলেক্‌ট্রন ব্যবহারের দিকেও খানিকটা এগিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নেই শুধু এই অতি ক্ষুদ্র পদার্থকণাগুলি অতিমানবিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছে।

কারখানার নূতন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করার আগে স্টালিন যে অভিযান শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অভিনবত্বের কথা তুলেছিলেন সে কথা বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। তিনি বলেছিলেন যে লড়াইয়ের প্রথম বছরে সোভিয়েটের অস্ত্র শস্ত্র শত্রুপক্ষের চেয়ে ভালো হলেও সংখ্যার দিক থেকে অভাব ছিল কিছুটা। এই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন যে বড় বড় উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস বা হাতছাড়া হওয়া সত্ত্বেও এই অসুবিধা দূর হবেই। আমাদের কোনো ভাষ্যকারই স্টালিনের এই গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতের প্রতি মনোযোগ দেন নি।

লাল ফৌজের বিরাট অভিযান শুরু হলে পর সংখ্যার দিক থেকে যে কি অসম্ভব রকম উৎপাদন বাড়ানো গেছে সে খবর দুনিয়ার কাছে প্রকাশিত হল। তখন সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ সংঘের নেতা আলেকজাণ্ডার সের্‌বাকোভ শুধু বললেন : "দেশের সামরিক শক্তির দিক থেকে নূতন কাঁচামাল উদ্ভাবন ও নূতন কায়দায় তার ব্যবহার সম্পর্কে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" সের্‌বাকোভ্‌ সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক। বাজে কথা বলার তাঁর অভ্যাস নেই। তিনি অকপটেই সমস্ত পৃথিবীকে জানাচ্ছিলেন যে সোভিয়েট বিজ্ঞান ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

এই নূতন কৌশলের একটি হল ইলেক্‌ট্রনীয় উৎপাদন পদ্ধতি। এতে মানুষের শক্তির জায়গায় ইলেক্‌ট্রন ব্যবহার করা হয়।

বৈদ্যুতিক মোটরের কথা সবাই জানে। আমাদের কারখানায় যুদ্ধ বা শান্তির সময়কার সামগ্রী তৈরীর জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় বিদ্যুতই তা দেয়। এই ভাবে মানুষের মাংসপেশীর শক্তির স্থান নেয় এই বৈদ্যুতিক শক্তি।

আপনি কি কখনো 'রবট' বা যন্ত্রমানব দেখেছেন? এগুলি হল অদ্ভুত বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা সহজ সহজ হুকুম তামিল করতে পারে যেমন চেয়ার থেকে ওঠা, হাঁটা বা করমর্দন করা। বহু বছর ধরে লেখকেরা এমন রবটের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যা চিন্তা করতে কিম্বা অন্তত কায়িক পরিশ্রম করতে পারে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন যন্ত্রমানব সত্যসত্যই কাজ করছে। স্নায়ুর পরিবর্তে এর আছে বৈদ্যুতিক তার। চিন্তার বদলে রবটের মাথায় গিজগিজ করছে ইলেকট্রন যার আছে চোখ, নেই কোন ভ্রান্তি বা শ্রান্তি বোধ। চোখের পলকও তাকে ফেলতে হয় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর চোখ অদ্ভুত সব নক্সার দিকে থাকে তাকিয়ে। তামা, কাঁচ ও ইলেকট্রনে তৈরী এই অদ্ভুত প্রাণীটি বসে থাকে কোনো অফিসে কিন্তু আধখানা দালান দূরে যন্ত্রাগারে হয়ত তার হাত কাজ করে।

এই অদ্ভুত কলটি কি কাজ করে? শুধু এই—এর আলোক-বৈদ্যুতিক চোখ নূতন ধরনের এক রকম নক্সা পাঠ করতে পারে। এই নক্সায় থাকে যন্ত্রের জটিল কাজকর্মের কথা। যন্ত্রমানব নক্সা পাঠ করে, বৈদ্যুতিক হাতের কাছে তারের স্নায়ু মারফৎ পাঠায় ইলেকট্রন-চিন্তা আর এক মস্ত ধাতু উৎসারী 'লেদের' উপর সব কিছু নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের তত্ত্বাবধান করে।

অর্থাৎ এই যন্ত্র স্থান নেয় লেদ-পরিচালক মানুষের।

কিন্তু সোভিয়েট আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নয় মানুষের মেহনতকে বাতিল

করা। কয়েকটি দরকারী দিক দিয়ে যন্ত্রমানব সব থেকে দক্ষ মানুষ কারিগরের চেয়েও অনেক শ্রেষ্ঠ। প্রথমত নক্সা পাঠে এর দক্ষতা অভ্রান্ত, আর 'লেদও' সর্বদাই এই নৈপুণ্য অনুযায়ীই কাজ করে। এরই ফলে স্বল্পতম সীমানার মধ্যে ব্যাপকতম উৎপাদন সম্ভব হয়। তার পরে যন্ত্রমানবের পক্ষে ভুল করা সম্ভব নয়। তার যন্ত্রপাতি প্রয়োগের কাজ যাচাই করার দরকার নেই কারণ নক্সায় যা আছে তা তৈরী জিনিসটাতেও থাকবেই।

তারপর যন্ত্রমানব বিনা বিশ্রামে দিনে চব্বিশ ঘণ্টা খাটতে পারে। তার শ্রান্তি নেই, অসুখ বিসুখ নেই—নেই কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

আর সবশেষে এই আশ্চর্য যন্ত্র তার এক জোড়া চোখ ও কাঁচের টিউবের ভিতরকার মগজ নিয়ে দুটো, এক ডজন, পঞ্চাশটি, একশটি 'লেদ' চালাতে পারে। সব কটাতেই ঠিক একই রকম নিখুঁত কাজ পাওয়া যাবে! উৎকৃষ্ট ধরনের ভারী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই রকম আবিষ্কারের মূল্য কি তা সবাই বুঝতে পারে। সেরবাকোভ যখন সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক কর্তৃক "দেশের সামরিক শক্তির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ" রুশ কাঁচামাল ব্যবহারের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারের কথা বলেছিলেন তখন তিনি এর ও এই ধরনের আবিষ্কারের কথাই ইঙ্গিত করেছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে বহু সহস্র সুদক্ষ যন্ত্রচালককে শিক্ষিত করে তোলার 'অসম্ভব' সমস্যা সমাধান করল সোভিয়েট। যন্ত্র পরিচালনার ভার ইলেকট্রনীয় মস্তিষ্কের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে সমস্যার জবাব পাওয়া গেল। যন্ত্রমানবকে যন্ত্রচালনার কৌশল শেখাতে হলে শুধু তার হাতে একটি নূতন নক্সা দিলেই হয়। তার ইলেকট্রন চোখে কোনো নক্সাই জটিল বোধ হয় না।

বিস্মৃত ভবিষ্যদ্বাণী

১৯৩১ সালে স্টালিন এক বক্তৃতা দেন। আমাদের দেশে তাঁর কথায় বিশেষ কোনো মনোযোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই বক্তৃতা ইতিহাসের সব থেকে আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলির অন্যতম বলে গণ্য হবে।

স্টালিন তার ১৮ কোটি দেশবাসীকে সতর্ক করলেন এই বলে—"আমরা উন্নত জাতিগুলির একশ বছর পিছনে পড়ে আছি।"

তারপর তিনি এই ভীষণ ও সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন "দশ বছরের মধ্যে আমাদের এই ব্যবধান ঘুচাতে হবে নইলে ওরা আমাদের নিঃশেষ করবে।"

এই বক্তৃতার দশ বছর পরে হিটলার য়ুরোপের সমস্ত উন্নত দেশগুলির শিল্পপুষ্ট বিশাল বাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চালিত করল।

স্টালিন এবার সমস্ত দুনিয়াকে বললেন "জার্মানরা তাদের বিদ্যুত গতিতে জয়ের পরিকল্পনা গোপন রাখেনি। বরঞ্চ তারা সব রকমে এরই জয়ঢাক বাজিয়েছে।......তাদের হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাবাড় করতে দেড় থেকে দু মাস সময় লাগবে......এই উদ্ভট পরিকল্পনা যে সব দিক থেকে ভ্রান্ত তা বলা বাহুল্য।"

আমাদের সামরিক ও শিল্পবিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করেন যে ঐ দশ বছরে সোভিয়েট একশ বছরের অনগ্রসরতা দূর করে হয়ত আরো বেশী কিছু করেছিল। এ সব হল দশ বছরের মধ্যে। হিটলার

ওদের পর্যুদস্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু তার পরিকল্পিত বিদ্যুৎ অভিযান শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়।

সবাই চমকে গেল। অন্যান্য সম্মিলিত শক্তির বিশেষজ্ঞরা এখনও হতভম্ব। আর হিটলারের বিশেষজ্ঞরা তো মুহ্যমান। একশ বছরের অগ্রগতির পথ দশ বছরে অতিক্রম করতে সোভিয়েট কোন্ ইন্দ্রজাল ব্যবহার করেছে ?

কোনো ইন্দ্রজালই নয়। তারা প্রয়োগ করছে নববিজ্ঞান। এরই সাহায্য তারা এমন সব অস্ত্রসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করেছে যা কখনও কোনো দেশ করেনি। সোভিয়েট ইউনিয়নের বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞরা ঐ দশটি গুরুত্বপূর্ণ বছরের পরিকল্পনা করেছে আর যোশেফ স্টালিন তাদের পরিকল্পনায় ভাষা যুগিয়েছেন—দিয়েছেন সেগুলি দেশবাসীর হাতে।

স্টালিন প্রথমে বলেছিলেন "আমাদের পক্ষে যন্ত্রকৌশলই (অর্থাৎ বিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ) সব কিছুর নিয়ন্তা।" পরে তিনি বললেন "যন্ত্রকৌশল এখন আমাদের আয়ত্তাধীন। এখন সুদক্ষ কর্মীরাই (অর্থাৎ যারা বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারে) সব কিছুর নিয়ন্তা।"

ঘটল এই। ১৯১৭ সালে সোভিয়েটে ২১০টি মাত্র গবেষণাগার ছিল। ১৯৩৭এ হল ২,২০০টি। এই ভাবে যন্ত্রকৌশল ওরা আয়ত্ত করল।

১৯১৭ সালে ওদের দেশে ১২ কোটি লোক ছিল নিরক্ষর। ১৯৩৭ সালে তাদের ৯ কোটি লোক বিজ্ঞান বুঝতে আর প্রয়োগ করতে পারত (যন্ত্রপরিচালক)। এই ভাবে তারা পেল সুদক্ষ কর্মী।

১৯৩৭ সালে টেকনিক্যাল স্কুল বাদ দিয়েও সোভিয়েটে ৭১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সমস্ত য়ুরোপে

যত দেশ আছে (গ্রেট বৃটেনও আছে এ হিসাবের মধ্যে) এমন কি জাপানকেও ধরা চলতে পারে এ হিসাবে—তাদের সকলকে একত্র করলেও সোভিয়েটের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল তার চাইতেও বেশী।

গণতান্ত্রিক দেশের লোক একদিন সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঠাট্টা করত আর বলত এ সব অঙ্ক হচ্ছে গাঁজাখুরী। কিন্তু এ সব মিথ্যা নয়—খাঁটি বাস্তব ঘটনা। অবশ্য ভাগ্য ভালো যে এগুলি সত্য! বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ যেখানে মানুষ হিটলারের নৃশংস রণকৌশলের সঙ্গে পরিচিত—সেখানেও চার্চিল থেকে আরম্ভ করে খবরের কাগজ বিক্রেতা পর্যন্ত সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল যখন স্টালিন দুনিয়াকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে বিদ্যুৎ আক্রমণ প্রতিহত হয়েছে আর "সোভিয়েটের মজুদ অস্ত্রসজ্জা এই এখনই শুধু পুরোপুরিভাবে বাড়তে শুরু করেছে।"

এবার একটি বক্তৃতার কথা বলব যা রাশিয়ার বাইরে বড় একটা শোনা যায়নি। এটি স্টালিনের বক্তৃতা নয়—এর লক্ষ্য হলেন স্টালিন।

"প্রিয় জোসেফ ভিশারিয়োনোভিচ! আমরা লক্ষ্য করছি সমস্ত বিশ্বের পরে চরম সংকট আসন্ন। আমরা জানি ফ্যাশিস্টদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতাকে রক্তাক্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা, দুনিয়ার মানুষকে নিঃশেষ করা ও দাসত্ব বন্ধনে বাঁধা—ইতিহাসের মুখ পিছনে ফিরিয়ে দেওয়া আর মানব সংস্কৃতিকে দু পায়ে দলা। তুমি বলেছ মানুষই হচ্ছে সব থেকে দামী জিনিস। আমরাও আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের রাষ্ট্রকে বাঁচাবার জন্য—ছোট বড় প্রত্যেক মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করছি। আমরা মানবধর্মী। আমরা আমাদের মানুষকে ঐশ্বর্য বলে মনে করি। দস্যুদের পায়ের নীচে আমরা লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু মানুষের আর্তনাদ শুনছি আর আমরা আমাদের হাতিয়ার

বিজ্ঞানকে আরো আঁকড়ে ধরেছি। আমাদের ভাইবোনদের মৃত্যু, লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে রক্ষা করবার জন্য বিজ্ঞান আমাদের দেশের অশেষ ধনসম্পদ উদ্‌ঘাটিত করবে। প্রিয় জোসেফ ভিশারিয়োনোভিচ! তোমার কাছে এই অলঙ্ঘ্য ও সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি জানাচ্ছি যে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আধুনিক প্রগতিশীল বিজ্ঞানের অসীম শক্তি প্রয়োগ করব। সে শক্তি ক্রমাগত এগিয়ে চলে, কোনো বাধা মানে না, সমস্ত সীমানা ছাপিয়ে যায়! বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যে আমরা ফ্যাশিস্ট পশুকে সম্পূর্ণ বিনাশ করব।"

যে মানুষটি এই কথাগুলি বললেন তিনি হচ্ছেন এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক —ভ্লাডিমির কোমারভ। তিনি হচ্ছেন সোভিয়েটের বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি—অর্থাৎ সমগ্র সোভিয়েট বিজ্ঞানের নেতা।

প্রথম প্রথম বোধহয় আপনারা মনে করেছিলেন যে আমি হয়ত সোভিয়েট ইউনিয়নে নূতন বিজ্ঞানের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলছি। না, এ কথা সত্যই যে নববিজ্ঞান হচ্ছে রাশিয়ার মহাস্ত্র, বীর লাল ফৌজের ও সোভিয়েট গ্যেরিলার অস্ত্র, হিটলারী কসাইদের হাত থেকে যাঁরা বিশ্ব-সভ্যতাকে বাঁচাচ্ছে সেই সমগ্র রুশ জাতির হাতিয়ার।

ডাঃ কোমারভের কথাগুলি আবার সময় নিয়ে পড়ুন। আমাদের দেশের কোনো বৈজ্ঞানিক বা এঞ্জিনীয়ারকে কি আপনি ঐ ভাষায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলতে শুনেছেন? নিশ্চয়ই না। আমাদের বিজ্ঞানকে যে অনাথ বলে গণ্য করা হয়। আমাদের বিজ্ঞানীদের "মাথা ঠাণ্ডা" রাখতে ও "প্রাত্যহিক জীবন থেকে দূরে থাকতে" উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে সমগ্র জাতি ও বৈজ্ঞানিক নরনারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না।

পরিষদের সভ্য ডাঃ কেলার একটি প্রবন্ধ মারফৎ লেখককে স্পষ্টই

জানিয়েছেন "এ কথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো পৃথিবীতে এই প্রথম বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিরাট পরিণতি ও স্বীকৃতির প্রতিনিধিত্ব করেছে।"

কি করে এ সব হল

আপনি বলবেন "আসল ব্যাপারটা কি জানা যাক। রাশিয়ায় বিজ্ঞানকে কিভাবে সংগঠিত করা হল ?"

স্টালিন ও সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা যে বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তার প্রধান প্রধান কাজগুলি হল মোটামুটি এই :—

(১) সোভিয়েটের প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর মনে এই ধারণাটি গভীরভাবে এঁকে দেওয়া হল যে বিজ্ঞান হচ্ছে উন্নততর জীবন লাভের পক্ষে মানুষের হাতিয়ার। প্রমাণিত হল যে জনগণ ঐ বিজ্ঞান বুঝতে ও প্রয়োগ করতে ভীষণ উৎসুক।

(২) লক্ষ লক্ষ চাষী ও মজুরকে তাদের প্রাত্যহিক কাজের সমস্যাগুলি নিকটতম বিজ্ঞান কেন্দ্রে পাঠাতে অনুরোধ করা হল। বিজ্ঞান আর উন্নাসিক রইল না।

(৩) দিনরাত্রি গবেষণাগারের কাজের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করা হল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত করার মত আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি রইল না।

(৪) এঞ্জিনীয়ররা সাগ্রহে প্রত্যেকটি গবেষণাগারের বিবরণী পাঠ করল ও অবিলম্বে সব থেকে যে সব প্রস্তাবের মধ্যে সম্ভাবনার বীজ নিহিত আছে সেগুলিকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করল।

(৫) এগুলি কার্যকরী হলেই সরকারী পরিকল্পনা কমিশন সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রে এগুলির ব্যাপক প্রয়োগের ব্যবস্থা করল।

(৬) শুধু গবেষণা নয়, গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার ভারও অনেকটাই শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকদের হাতে দেওয়া হল।

(৭) শেষ পর্যন্ত চাষী মজুররাই নূতন আবিষ্কারকে যাচাই করতে লাগল কারণ তাদেরই কাজে লাগার জন্য আবিষ্কার। কাজের গতিকে শ্লথ করবার আগেই এইভাবে অবাস্তব ধারণাগুলিকে হটিয়ে ফেলা হল।

(৮) জনকয়েক নয়, লক্ষ লক্ষ তরুণ ও বৃদ্ধ যোদ্ধারা যেমন করে লড়াই করতে শেখে তেমনি প্রাণপাত করে বিজ্ঞান শিক্ষা করতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যা সময় লাগে তার দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে এ সব বিষয় আয়ত্ত করা হল।

আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞরা এখন প্রাণপণে চেষ্টা করছেন যুদ্ধের জন্য বিজ্ঞানকে সংগঠিত করতে ও তার কাজের গতিকে বাড়িয়ে তুলতে। সোভিয়েট ইউনিয়নে বিজ্ঞান বরাবরই ছিল যুদ্ধের জন্য তৈরী। সে যুদ্ধ দুঃখ কষ্ট, প্রাণপাত পরিশ্রমের বিরুদ্ধেও বটে আবার সমস্ত নরনারী ও শিশুর মানবজীবন যাপনের অধিকার সাব্যস্ত করার যুদ্ধও বটে।

আপনার কি মনে হয় যে, আমি বাড়িয়ে বলছি? তাহলে গত বছর সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের স্টালিন পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে সমস্ত সোভিয়েট নরনারীর কাছে ডাঃ কেলারের বক্তৃতাটির কথা মনে করুন :—

“জাতীয় ভিত্তিতে নূতন, উন্নত বিজ্ঞানের পর্যালোচনাই হল আসলে এই পুরস্কারের লক্ষ্য। একটি অভিনব ও প্রধান সামাজিক লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে—জনগণের মধ্যে থেকে অনেক নরনারী এগিয়ে আসছেন। জনসাধারণ এঁদের চেনে—এঁদের প্রতি তাদের আস্থা আছে।...অর্থাৎ মোটের উপর সোভিয়েট ইউনিয়নে বৈজ্ঞানিকের ধরনই গেছে বদলে। বলা যেতে পারে জারের রাশিয়ায় বুদ্ধিজীবীরা ‘দার্শনিকের’ মত শুধু

মস্তিষ্ক চালনা করে সমস্ত দুনিয়া ও তার জটিলতার রহস্য উদ্ঘাটন করবার প্রয়াস করতেন—আর সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের বিজ্ঞানীদের ডাক পড়েছে দুনিয়া বদলাবার কাজে কোমর বেঁধে লাগতে।"

যুদ্ধ সীমান্তের আসল লড়াই ছেড়ে এবার কিছুক্ষণের জন্য ফ্রণ্টের পিছনকার জীবনের দিকে নজর দেওয়া যাক।

বিজ্ঞানের হাসপাতাল গড়া

বেশ কয়েক বছর আগে জনকয়েক ইংরেজ ডাক্তার মস্কোর এক হাসপাতাল দেখতে যান। তাঁরা লণ্ডনে ফিরে খুব উৎসাহের সঙ্গে কি দেখেছেন তার বিবরণ দিতে থাকেন। কেউ কিন্তু তাতে কান দিল না। যারা বর্ণনা পড়ল তারা বলল "আরো এক দফা রুশ প্রচার।" এবার আসল ব্যাপার প্রকাশ হচ্ছে। বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক চিকিৎসকদের ঐ হাসপাতাল দেখানো হয়েছে। এবারকার বিবরণীগুলি মনোযোগের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে কারণ সর্বত্রই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন যে বিজ্ঞানের এক অঙ্গ, এই ভেষজ-বিদ্যা সোভিয়েট ইউনিয়নে আশ্চর্য রকম এগিয়ে গেছে।

এ কথা বুঝবার জন্য ডাক্তার হবার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি ঐ হাসপাতাল দেখতেন তবে সঙ্গে সঙ্গেই আপনিও ধরতে পারতেন রুশ চিকিৎসা-বিদ্যায় কি ঘটেছে। কিন্তু মস্কোয় যাবার আমাদের সুবিধা নেই। তাই এ ছাড়া সব থেকে ভালো পন্থা হিসাবে আমরা একটা কাল্পনিক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারি।

মস্কো কেন্দ্রীয় 'এমারজেন্সি' হাসপাতালের বাড়ীটা চমৎকার। দেখলে হাসপাতালের চেয়ে প্রাসাদ বলেই ভুল হয়। এর গঠন অন্য রকম হলেও চলত কারণ এই ধরনের হাসপাতালের চেহারা দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। এর নামেই প্রমাণ যে এই হাসপাতালে শুধু অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেরই ব্যবস্থা হয়। হঠাৎ দুর্ঘটনায় আহত অথবা হঠাৎ রোগাক্রান্ত মানুষেরই এখানে চিকিৎসা হয়।

এই ধরনের রোগীর জন্য বিশেষ হাসপাতালের কি প্রয়োজন? রাশিয়ার ডাক্তারেরা এই উত্তর দেন—"আকস্মিকতার ক্ষেত্রে মানুষের জীবন অনেক সময় কয়েক মিনিট, এমন কি কয়েক সেকেণ্ডের এদিক ওদিকের পরে নির্ভর করে। সে ক্ষেত্রে জীবন রক্ষার অর্থ—ঠিক কি কর্তব্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান, কর্তব্য পালনের উপযোগী সরঞ্জাম হাতের কাছে থাকা আর তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলা। "এমারজেন্সি ওয়ার্ড" থাকলেও সাধারণ হাসপাতাল যথেষ্ট নয়। আমরা একেবারে গোড়া থেকে অর্থাৎ দুর্ঘটনার কারণ থেকে শুরু করেছি আর তার ভিত্তিতেই নূতন চিকিৎসার সংগঠন গড়ে তুলেছি।"

ধরুন আপনি মস্কোর কোনো সাংঘাতিক দুর্ঘটনার সাক্ষী। রাস্তার একটি গাড়ীর সামনে এসে পড়েছেন ধরুন কোনো বৃদ্ধা। আপনি হয়ত সামনের কোনো ওষুধের দোকানে দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। আপনি মস্কোতে যার কাছেই খবর দিতে যান না কেন—সে পুলিশ, ডাক্তার বা হাসপাতাল যাই হোক—টেলিফোন পরিচালক আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে মস্কো এমারজেন্সি হাসপাতালের লাইন দেবে। সেখানকার টেলিফোন পরিচালিকা মন দিয়ে সব কথা শোনেন। তিনি গলার স্বর থেকে মানুষের মন বোঝার ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত। আপনার কথা বলার ভঙ্গী থেকে তিনি তখনই বুঝতে পারেন যে সত্যই একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, হয়ত বেশ খারাপ রকম দুর্ঘটনাই। আপনাকে বাধা না দিয়ে তিনি একটি সুইচ্ টেপেন। দু তলা নীচে হাসপাতালের পিছনে রাস্তার উপরকার গ্যারাজে লাল আলো দপ্ করে জ্বলে ওঠে আর ঘণ্টা বাজে। মস্ত লম্বা সারির থেকে একটি দ্রুতগামী এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর চালক মোটর স্টার্ট করেন। বিশ্রাম কামরা থেকে দুজন ডাক্তার দৌড়ে আসেন এ্যাম্বুলেন্সের দিকে। দশ সেকেণ্ড

পরে টেলিফোন পরিচালিকা দুর্ঘটনা কোথায় হয়েছে তার ঠিকানা জেনে রেডিও মারফৎ এ্যাম্বুলেন্সকে জানায় আর গাড়ী চলতে শুরু করে।

বৈদ্যুতিক ঘড়ির কাঁটায় সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। হাসপাতালের নিয়মে টেলিফোনের ডাক ও এ্যাম্বুলেন্সের প্রস্থানের মধ্যে দু মিনিটের বেশী সময় লাগতে পারে না। এর বেশী লাগলে তাই নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। একটি এ্যাম্বুলেন্স বেরিয়ে গেলে আর একটি তার জায়গা নেয় আর আরো দুজন ডাক্তার পরের ডাকের জন্য প্রস্তুত হন।

মস্কোর কেন্দ্রীয় এমারজেন্সি হাসপাতাল এক আশ্চর্য ব্যাপার। এর মন্ত্র হচ্ছে: "প্রাণরক্ষা ও যন্ত্রণা উপশম।" এই হাসপাতালে আছে ৭০০ বেড। ১০০ জন ডাক্তার সব সময়ে কাজের জন্য প্রস্তুত থাকেন আর সমসংখ্যক ডাক্তার থাকেন 'রিজার্ভে।' এই সব নিয়ে কেন্দ্রীয় হাসপাতাল শান্তির সময়েও বছরে ৬০,০০০টি আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসা করে। এই বিপুলসংখ্যক দুর্ঘটনার সঙ্গে তাল রাখবার জন্য মস্কো হাসপাতালকে অভ্রান্ত সন্ধানীদের চেয়েও তাড়াতাড়ি কাজ করবার উপযোগী করে সংগঠিত করতে হয়েছে।

টেলিফোন পরিচালিকা ও এ্যাম্বুলেন্সচালক নিয়েই এ সংগঠনের আরম্ভ। মস্কোর প্রত্যেক পাড়া ও রাস্তা এদের নখদর্পণে। পাঁচটি এ্যাম্বুলেন্স কেন্দ্র আছে একটি হাসপাতালে আর চারটি মস্ত শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। ক্ষিপ্র কাজ করা প্রয়োজনীয় বলে বহু গাড়ীর ব্যবস্থা আছে আর টেলিফোন পরিচালিকা সুইচ্ মারফৎ দুর্ঘটনার নিকটতম কেন্দ্রে সংকেত পাঠায়।

এ্যাম্বুলেন্স চলে যাবার পর কেন্দ্রীয় হাসপাতালের টেলিফোন পরিচালিকা যিনি ফোন করছিলেন তাঁর কাছ থেকে আরো বিবরণ পেতে চেষ্টা

করেন। রেডিও মারফৎ এ সব খবর যে ডাক্তাররা 'কলে' গেছেন তাঁদের জানানো হয়। তারপর 'অপারেশন' ঘরেও খবর দেওয়া হয় যাতে রোগী যখন পৌঁছয় তখন যেন যে ডাক্তার ও যন্ত্রপাতির দরকার তা তৈরী থাকে।

মস্কো হাসপাতালে 'হাত পাকানোর' সুবিধা নেই। কর্মচারীর তালিকায় নাম তুলতে হলে ডাক্তারকে দশ বৎসর কোনো বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। ধারণা হল এই যে আকস্মিকতার সঙ্গে যুঝতে হলে সব থেকে বেশী দক্ষতার প্রয়োজন। মস্তিষ্কের অস্ত্র-চিকিৎসক, স্নায়ুবিশারদ, অস্থিবিশেষজ্ঞ, আভ্যন্তরীণ রোগ-চিকিৎসক, রোগ-নির্ণয়বিদ সবারই প্রাণরক্ষার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা কাজ। বৃটিশ সামরিক অস্ত্র-চিকিৎসকদের মতে এই হাসপাতালের সরঞ্জাম শুধু আকস্মিক দুর্ঘটনার পক্ষে নয়, দুর্ঘটনাসংক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাময় করবার জন্য পরে জটিল অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার পক্ষেও অপর্যাপ্ত ও অতুলনীয়। এই হাসপাতালেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েটের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

রক্ত দেবার সুপরিচিত ব্যাপারটাই ধরা যাক। সমস্ত দুনিয়ায় হাসপাতাল বা যুদ্ধক্ষেত্রের কাজের সুবিধার জন্য মানুষের রক্ত জমিয়ে বা শুকিয়ে রাখা হয়। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা বেশ সাম্প্রতিকই বলা চলে। রাশিয়ায় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এর সূত্রপাত। রক্ত সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে মস্কো হচ্ছে সর্ববাদিসম্মত প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য দেশকে এদিকে সে বহু পিছনে ফেলেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি সাংঘাতিক রকম রক্তস্রাবী দুর্ঘটনাক্রান্ত ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় এমারজেন্সি হাসপাতালে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলে তাকে জীবিত লোক থেকে নেওয়া জমানো রক্ত না দিয়ে সোজাসুজি মৃত ব্যক্তির

রক্তও দেওয়া হতে পারে। ধরুন এমন একজন লোকের রক্ত যিনি আগেই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন।

এই বিস্ময়কর নূতন কৌশল আজ অসংখ্য রুশ জীবন রক্ষা করছে। এই পদ্ধতিটি মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতালে পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেল কোনো কোনো মৃত্যুর ক্ষেত্রে রক্ত অন্যান্য রক্তের চেয়েও অনেক বেশী নিরাপদ ও অন্যের দেহে দেবার উপযুক্ত। যখন কোনো লোক কোনো যন্ত্রণা ভোগ না করে মূহূর্ত মধ্যে মারা যায় তখন তার দেহ থেকে উপযুক্ত উপায়ে রক্ত নিলে একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যে কোনো রকমের মৃত্যুর মতই প্রথমে রক্ত জমে যায় কিন্তু শীঘ্রই আবার তা তরল হয়ে যায়। আর কোনো রাসায়নিক পদার্থ না মেশালেও সেটি তরল থেকে যায়। এই জন্য ও আরো অনেক কারণে অন্য দেহে যোগান দেবার পক্ষে এবং রুগ্ন বা আহত ব্যক্তির নিরাময়ের জন্য মৃত ব্যক্তির রক্তই সব থেকে ভালো।

রুশ ডাক্তারেরা ফ্রণ্টে এই প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন। কি ভাবে তা হচ্ছে সে হল সামরিক গুপ্ত খবর। বৃটিশ ও মার্কিন চিকিৎসকদের কাছে পন্থাটি প্রকাশ করা হয়েছে। যা দেখেছেন তাই নিয়ে তাঁরা খুবই আগ্রহশীল। যাঁরা মারা গেছেন তাঁদেরই সাহায্যে মুমূর্ষু নরনারীকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে যে বীরেরা প্রাণ দিচ্ছেন তাঁরাই অন্য নবজীবনপ্রাপ্ত মানুষের দেহে পুনর্জীবন লাভ করেছেন। নিশ্চয়ই এর চেয়ে বীরত্বমণ্ডিত অমরত্বের কথা কেউ কখনো ভাবতে পারেনি!

কেন্দ্রীয় হাসপাতালের বিশেষজ্ঞেরা যুদ্ধসংক্রান্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পথ দেখিয়েছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার বৈপ্লবিক উপায়টির কথাই ধরুন। এ সবেরই সূত্রপাত কেন্দ্রীয় হাসপাতালে। পরীক্ষায় প্রমাণ হল যে সাংঘাতিক

বৈদ্যুতিক 'শকের' রোগীকে যথাসম্ভব কম নড়াচড়া করা উচিত। এ্যাম্বুলেন্স কারিগরেরা অমনি লাগল কাজে। আর অদ্ভুত চাপ লাগানো এক রকম 'ষ্ট্রেচার' বানালো যাতে রোগী যেখানেই থাকুক না কেন তাকে আলগা করে বেঁধে আস্তে তুলে নিতে পারে।

সামরিক চিকিৎসকেরা যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে কারখানামুখো দৌড়লেন। সেখানে তৈরী হল উদ্ধার করার ট্যাঙ্ক। এই আশ্চর্য এ্যাম্বুলেন্স প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে অনায়াসে ঢোকে, আহত মানুষের ঠিক উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় (চাকার মত কলে তাকে বেঁধে ফেলে), যন্ত্রের পেটের কাছে একটা লুকোনো দরজা খুলে সৈন্যটিকে নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ভারী ভারী অস্ত্রসজ্জা ডাক্তার, নার্স প্রভৃতি উদ্ধারকারীরা ভিতরের আহত ব্যক্তিকে রক্ষা করতে থাকে।

আপনার আমার হয়ত কখনো মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতালের "বৈদ্যুতিক শক রোগীর ষ্ট্রেচার" না লাগতে পারে। কিন্তু আর একটি আবিষ্কার আমাদের সকলের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরী। এটি হল অস্ত্রোপচারকে যন্ত্রণামুক্ত করবার নূতন এক পদ্ধতি। কোনো কোনো বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা অস্ত্রচিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্লোরোফর্মের পরে একেই সব থেকে বড় আবিষ্কার বলে মনে করেন।

আপনাকে কখনো স্থানীয় 'এ্যানেসথেটিক' ব্যবহার করতে হয়েছে কি? যেমন ধরুন দন্তচিকিৎসক দাঁত তুলবার আগে যে প্রক্রিয়ায় জায়গাটা অসাড় করে নেন বা নাকের উপর যখন ছোটখাটো অস্ত্রোপচার হয়।

১৯৪০ সালে বিখ্যাত সোভিয়েট অস্ত্রচিকিৎসক ভিস্‌নেভস্কি এই সুপরিচিত 'এ্যানেসথেসিয়া' গুরুতর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার সূত্রপাত করলেন। তাঁর কৌশলটা হল নূতন ধরনের। তিনি চামড়ার তলায় খুব কম মাত্রায়

নোভোকেন ও পারকেন ইন্‌জেক্‌শান করতে লাগলেন। যতই মাংস অসাড় হতে লাগল ততই ইনজেক্‌শনের ছুঁচটা আরো ভিতরে ঢুকিয়ে অল্প অল্প মাত্রায় অনেকখানি ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে ভিস্‌নেভ্‌স্কি দেখলেন যে বেশ অনেকটা জায়গা অসাড় করে ফেলা যায়। ছুঁচের মুখের চারিদিকে এই আরামপ্রদ ওষুধের কাজ হতে থাকে।

ভিস্‌নেভ্‌স্কির প্রক্রিয়ায় কোন যন্ত্রণা নেই। দু মিনিটের মধ্যেও এতে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক দুর্ঘটনার রোগীও আরাম পায়। বমনের ইচ্ছা বা হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা প্রভৃতি পরবর্তী উপসর্গও এতে নেই। সব থেকে বড় কথা অস্ত্রোপচারের পরে অনেক সময়ই যে স্নায়বিক আঘাত সম্ভবতই ঘটে তা এতে অনেকখানি কমে যায়।

গত বছর সোভিয়েট রসায়নবিদরা ভিস্‌নেভ্‌স্কিকে 'সভকেন' নামে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি নূতন ওষুধ দিয়েছিল। এর এক ফোঁটা ১০,০০০ ফোঁটা জলের সঙ্গে মেশালেও এতে কাজ হয়। কোনো ক্ষতি না করে একজন মানুষকে কয়েক পাঁইট এই জিনিস ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া যায়। জায়গাটা অসাড় থাকে চার থেকে ছ ঘণ্টা।

ভিস্‌নেভ্‌স্কি পন্থা এত আশ্চর্য রকম সাফল্যলাভ করল যে এখন এটি মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতালে হাড় ভাঙা, হাড় কেটে বাদ দেয়া, পেটে অস্ত্রোপচার, ক্যানসার প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যখন কোনো অঙ্গ বাদ দেবার দরকার হয় সভকেন দিনের পর দিন জায়গাটাকে অসাড় রাখে যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্ষতটা বেশ সেরে আসে। .

যুদ্ধে আহতদের পক্ষে ভিস্‌নেভ্‌স্কির পন্থা আশ্চর্য। ফিনল্যাণ্ড অভিযানের যে লড়াই নিয়ে বহু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তাতেই স্‌ভকেন দ্রুত যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়েছিল অথচ তার ফলে সৈন্যরা অসুস্থ বা অসহায় হয়ে পড়েনি। একই রকম অবস্থায় যখন সাধারণ 'এ্যানেসথেসিয়ার' পাশাপাশি

এর পরীক্ষা হল তখন দেখা গেল যে ভিস্‌নেভস্কি প্রক্রিয়ায় ক্ষত থেকে মৃত্যুর হার শতকরা ৪০ ভাগ কমে গেছে।

মিত্রশক্তিপুঞ্জের চিকিৎসকেরা যে এই সোভিয়েট পন্থা কাজে লাগাতে উৎসুক এ কথা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি রাষ্ট্রদূত মায়েস্কি ও লর্ড হর্ডার ঠিক এই ধরনের সহযোগিতার জন্যই ইঙ্গ-সোভিয়েট মেডিক্যাল কমিটি গঠনে তৎপর হয়েছিলেন। কমিটি যাতে ভালোভাবে কাজ শুরু করতে পারে তার জন্য মায়েস্কি এই উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়ে চিকিৎসকদের অবাক করে দেন: "আপনারা না জানতে পারেন যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার আজীবন কৌতূহল আছে।" এর পর তিনি হেসে বলেন: "আমার পিতার গবেষণাগারে যখন থেকে গিনি-পিগদের খাওয়ানো ও পরিষ্কার রাখার ভার আমার উপরে ছিল তখন থেকেই!"

বিখ্যাত ইংরেজ অস্ত্রচিকিৎসক, রস্কো ক্লার্ক অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বললেন: "ইতিহাসের গতিই বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণের মধ্যে যে অবিশ্বাসের পর্দা ছিল তা বহুলাংশে অপসারিত করেছে আর আমাদের বুঝতে শিখিয়েছে এমন কোনো কোনো জিনিস, যা রক্ষার জন্য সোভিয়েটের মানুষ প্রাণপাত করছে।"

"কেন্দ্রীয় এমারজেন্সি হাসপাতালে" যা কিছু আশ্চর্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সবারই ফিরিস্তি এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। একটি আধুনিকতম উন্নতি ঘটেছে মাতৃত্ববিদ্যা সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় হাসপাতালে একটি "এমারজেন্সি" মাতৃত্ব বিভাগ আছে। এর কাজ আকস্মিক ও কষ্টকর প্রসবের সম্পর্কে। এখানেই সোভিয়েট চিকিৎসকেরা জরায়ুর রক্ত কাজে লাগাবার পন্থা অবিষ্কার করেন। এতদিন প্রসবের পর মাতৃদেহ এই খাঁটি ও প্রয়োজনীয় রক্ত থেকে বঞ্চিত হত। এখন সোভিয়েট

ইউনিয়নের সর্বত্র এই জরায়ুর রক্ত বাঁচানো হয়। অন্য দেহে চালান দিয়ে প্রাণরক্ষার সাহায্য হয়। মৃত ব্যক্তির রক্ত ব্যবহার সম্পর্কে কি বলা হয়েছিল মনে আছে তো? কাজেই এ কথা আক্ষরিক সত্য যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সোভিয়েট চিকিৎসাবিজ্ঞান মূল্যবান মনুষ্যজীবন রক্ষা করে।

সম্প্রতি সোভিয়েটে রক্ত সম্পর্কিত গবেষণা একটা আশ্চর্য রকম মোড় নিয়েছে। আপনারা জানেন নানা ধরনের রক্ত আছে। সোজাসুজি এক দেহ থেকে অন্য দেহে রক্ত চালান করতে হলে যিনি দিচ্ছেন তাঁর রক্ত রোগীর রক্তের সমপর্যায়ের হওয়া চাই। বিভিন্ন ধরনের রক্তমিশ্রণ বিপদজনক। কিন্তু এ সমস্যা নিয়ে গবেষণা করতে করতে ডাঃ স্পাশু-কুকোট্স্কি আবিষ্কার করেন যে খুব স্বল্পমাত্রায় (দু তিন চামচ) বিভিন্ন পর্যায়ের রক্ত কোনো কোনো রক্তদোষের ব্যারামে দেওয়া চলতে পারে। এরই সূত্র ধরে ডাঃ ব্যাগ্ডাসারোভ গুরুতর পাকস্থলী ক্ষত রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করেন। পরে তিনি ছাগলের রক্ত ব্যবহারেরও চেষ্টা করেন! ৩০০ ক্ষেত্রে এতে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। যন্ত্রণা, রক্তপাত ও অন্যান্য উপসর্গ সম্পূর্ণ দূর হল ও ক্ষতও একেবারে সেরে গেল। চর্মক্ষত নিয়েও এ ধরনের কাজ চলছে।

হাসপাতাল বা ডাক্তারদের সম্পর্কে কোনো সিনেমা দেখে থাকলে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন অস্ত্রোপচারের আগে অস্ত্রচিকিৎসকেরা কত সযত্নে তাঁদের সমস্ত হাত ধুয়ে নেন। এর উদ্দেশ্য বীজাণু দূর করা। এইভাবে রোগীর কাপড়জামা তোয়ালে ও একটা উনুনের মত জিনিস কয়েক ঘণ্টা রেখে সম্পূর্ণভাবে বীজাণু-মুক্ত করতে হয়। অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রপাতি সম্পর্কেও এ কথা খাটে। অবশ্য যথেষ্ট সরঞ্জামওয়ালা হাসপাতালে এ সব করা শক্ত নয় কারণ সেখানে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। কিন্তু

যুদ্ধক্ষেত্রে কি হয়? খুব সাংঘাতিক দুর্ঘটনার সময়ই বা কি করা হয়? সেখানে হাত ধোয়া বা জীবাণুমুক্তি প্রক্রিয়ায় কালক্ষেপ করার চেয়ে ডাক্তাররা বরঞ্চ রোগীর ছোঁয়াচ লাগার আশঙ্কারো সম্মুখীন হন।

মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতালের ডাঃ এ, এস, ড্যাভলেটভকে এ ধরনের ব্যাপার সন্তুষ্ট করতে পারল না। তিনি চাইলেন দ্রুত বীজাণু নষ্ট করবার শক্তি আয়ত্ত করতে। বহুদিন ধরে এ সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সবশেষে তিনি এক মামুলী রাসায়নিক পদার্থ—হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিয়ে পরীক্ষা করেন। প্রথমে তিনি একটি নোংরা বীজাণুভরা জলের মত জিনিসে হাত ডোবালেন, তার পরে ফের আবার ডোবালেন স্বল্পমাত্রার এসিডে। তিন মিনিট পরে কোনো ধোয়া পোঁছা না করেও চামড়ার উপর একটাও বীজাণু পাওয়া গেল না। বিশ মিনিটে এসিড যন্ত্রপাতিকে বীজাণু-মুক্ত করল। এই আবিষ্কারটি নিয়ে সযত্নে পরীক্ষা চালানো হয়। এখন শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয় রাশিয়ার শহরে হাসপাতালগুলিতেও এর ব্যবহার চলছে। অস্ত্রোপচার ব্যাপারটা এতে অনেক সহজ হয়ে গেছে।

দু কারণে আমি ড্যাভলেটভের এই আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করছি। এতে আমাদের দেশের যোদ্ধাদেরও প্রাণ রক্ষার সাহায্য হতে পারে। আর এ থেকে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সে বৈশিষ্ট্য হল সহজের সন্ধান। বারবার আপনারা দেখতে পাবেন যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জটিল ও বহু খরচের পন্থা থেকে সরে এসে সহজ ও সস্তা উপায়ের খোঁজ করতে করতে মস্ত বড় আবিষ্কার করেছেন। কেন? রাশিয়ায় কি ওরা পয়সা বাঁচাচ্ছে?

ড্যাভলেটভের বীজাণু-মুক্তির প্রক্রিয়াটাই ধরুন। এতে প্রায়

কোনো যন্ত্রপাতিই লাগে না। আজকাল আমাদের হাসপাতালে বীজাণু-মুক্তির যন্ত্রপাতির জন্য হাজার হাজার ডলার খরচ হয়। বড় বড় কোম্পানিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য হল সাধারণত হাসপাতাল, আফিস, কারখানা ও সৈন্যবাহিনীর জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো কারণ দর যত চড়বে কোম্পানির মুনাফাও তত ফেঁপে উঠবে। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে আমাদের হাসপাতাল, আফিস, কারখানা ও সৈন্যবাহিনীতে উত্তরোত্তর জটিল ও দামী সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছে। বলা হয় যে ঐ সব জিনিস সহজ জিনিসের চেয়ে "বেশী বৈজ্ঞানিক" কিন্তু এ কথা ঠিক হবেই এমন কোনো কথা নেই। চিরদিনই বিজ্ঞানের অন্যতম ধ্রুব লক্ষ্য হচ্ছে জিনিসকে সহজ করা। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে সবাই বুঝেছে।

সেখানে বৈজ্ঞানিকরা গোটা মুনাফালোভী বড় বড় কোম্পানির জন্যে কাজ করে না। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা কাজ করেন সমগ্র জাতির জন্য। কাজেই তাঁরা চান যাতে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর কাছে গিয়ে পৌঁছয়। তাই তাঁরা সর্বদাই সোজা জিনিস ও কম দামের জন্য চেষ্টা করেন।

ড্যাভ্‌লেটভের বীজাণু-মুক্তি পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই চিকিৎসকের লক্ষ্য ছিল মানুষের প্রাণ, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের প্রাণ বাঁচানো। কোনো টাকাওয়ালা শিল্পপতির নজর জটিল যন্ত্রপাতির দিকে ফেরানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর পদ্ধতি এত সহজ যে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ হয়েও এর মর্ম বুঝতে পারে—যুদ্ধের সময় আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার বেলায় বা শান্তির সময়ে কৃষিক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনার সময় এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে।

এই ধরনের উন্নতিব ফলে লাল ফৌজের চিকিৎসা বিভাগ আজ বলতে

পারে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুপাতে এ যুদ্ধে পেটে আঘাত লাগার জন্য মৃত্যু শতকরা ৩৩ ভাগ—মাথা, চোয়াল ও বুকের আঘাতজনিত মৃত্যু শতকরা ৫০ ভাগ ও মেরুদণ্ডের আঘাতের ফলে মৃত্যু শতকরা ৮০ ভাগ কমেছে। চোয়াল আড়ষ্ট হওয়ায় বা বিষাক্ত পচা ক্ষতের রোগী আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না। আগেকার যুদ্ধের এই দুই ছিল সব থেকে ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধিদের অন্যতম। আর ভিতরকার বিস্তৃত খবর সামরিক কারণে গোপন রাখা হলেও এ কথা জানা যায় যে সোভিয়েট ডাক্তারদের মুঠোয় আছে য়ুরোপের সব থেকে ভয়াবহ ব্যাধি টাইফাসের প্রতিষেধক ব্যাপকভাবে তৈরী করার কৌশল।

মস্কো এমারজেন্সি হাসপাতাল ছাড়বার আগে আরো একজন ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার। এঁর নাম ফিলাটভ। হয়ত এঁর ছবি আপনারা কাগজে দেখেছেন। রাশিয়া আমাদের মিত্রশক্তি বলে গণ্য হবার পর ফিলাটভ হঠাৎ সারা জগতে বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন।

তাঁর ক্ষমতা অলোকসামান্য। এই অস্ত্র-চিকিৎসক এমন সব কাজ করছেন যা কেউ কখনো সম্ভব বলে ভাবতে পারেনি। যেমন তিনি অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে রাশিয়ায় কেমন করে মৃত ব্যক্তির রক্ত দিয়ে মুমূর্ষুকে বাঁচানো হয়। ডাঃ ফিলাটভ চোখ নিয়েও তাই করেন। তিনি মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে চোখ তুলে নিয়ে জীবন্ত লোকের দেহে বসিয়ে দেন আর তারা চক্ষুষ্মান্ হয়ে ওঠে!

(এখন পর্যন্ত এ ধরনের অস্ত্রোপচার কয়েকটি বিশেষ ধরনের অন্ধতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে আরো খবর পেতে হলে ডন সোশাইটি, সান ফ্রান্সিসকো, ক্যালিফোর্ণিয়াতে চিঠি লিখতে পারেন। সেখানকার ডাক্তারেরা ফিলাটভ পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করছেন।)

ডাঃ ফিলাটভ চিকিৎসা জগতে "ভ্রুণতত্ত্ববিদ" হিসাবে বিখ্যাত। পশুরা ভূমিষ্ঠ হবার আগে গর্ভের ভিতরে কি ভাবে বেড়ে ওঠে সে সম্বন্ধে সম্ভবত তিনি পৃথিবীর সব থেকে বড় পণ্ডিত। তিনি বিশ্বাস করেন চোখের মতই মানুষের দেহের অনেক অংশ এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। তাঁরই এক ছাত্র, ডাঃ ওকুনেভ দাঁত নিয়ে ইতিমধ্যেই এ কাজ করে ফেলেছেন। তিনি ছোটদের 'দাঁত' জমিয়ে রেখে বড়দের চোয়ালে তা বসিয়ে দেন। সেখানে তুলে ফেলা দাঁতের জায়গায় এই নতুন দাঁত বেড়ে উঠতে থাকে। বাঁধানো মরা দাঁতের বদলে আপনি পান জীবন্ত দাঁত!

ফিলাটভ মৃত সৈনিকের দেহ থেকে জীবন্ত আহত মানুষের দেহে স্নায়ু লাগাবার উপযোগী অস্ত্রোপচারের কথা হালে ঘোষণা করেছেন। কাজেই তিনি এমন সব মানুষকে প্রাণ দিচ্ছেন যারা আগে হয় মারা যেত নয়তো অসহায় পঙ্গু জীবন যাপন করত। এই সব অস্ত্রোপচার দেখে বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক অস্ত্রচিকিৎসকেরা ফিলাটভ পদ্ধতির সরলতায় আশ্চর্য হয়ে গেছেন শোনা যায়। পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণাপীড়িত মানুষের মনে এই আবিষ্কার নূতন আশার সঞ্চার করেছে।

এইবার 'মস্কো এমারজেন্সি হাসপাতাল' থেকে বিদায় নেওয়া যাক। হয়ত কিছুক্ষণ ধরে আপনারা একটি প্রশ্ন করতে চাইছেন "এই আশ্চর্য জায়গায় যখন কাউকে তাড়াহুড়ো করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এই পুঙ্খানুপুঙ্খ চিকিৎসার খরচ যোগায় কে?"

রোগী যোগায় না—যোগায় সমগ্র জাতি! এরই নাম "চিকিৎসার সামাজিকতাসাধন" বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা।" রাশিয়ার বাইরে বহু চিকিৎসক এই ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী।

সম্প্রতি "মস্কো কেন্দ্রীয় হাসপাতাল" পরিদর্শন করতে গিয়ে জনৈক

ইংরেজ সামরিক অস্ত্রচিকিৎসক সেখানকার ডাক্তারদের কাছে নিজের মত ব্যক্ত করেন। তাঁরা কিন্তু এর কথার মানে বুঝতে পারলেন না। একজন রুশ ডাক্তার বললেন "এ ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন নয়! ডাক্তার, বলুন তো লণ্ডনে যখন আগুন লাগে তখন কি অগ্নিনির্বাপক বিভাগ যাঁর বাড়ী পুড়ল তাঁর কাছে খরচের বিল পাঠিয়ে দেয়?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তবে সেই লোকের যখন অসুখ করে বা দুর্ঘটনা ঘটে তখনই বা তাঁকে টাকা খসাতে হবে কেন? আগুন নেভানোতে যদি সবার স্বার্থ জড়িত থাকে তবে মানুষ যাতে সুস্থ থাকে তার প্রতি নজর রাখার সঙ্গেও প্রত্যেকের স্বার্থ জড়ানো আছে। বরঞ্চ বেশী আছে, কারণ আপনি আবার বাড়ী তুলতে পারেন কিন্তু কবর থেকে আর মানুষকে জিয়োনা যায় না। এর মধ্যে রাজনীতির নামগন্ধও নেই—এ হল সাধারণবুদ্ধির কথা!"

রাশিয়ায় ওরা আরো অনেক দূর অবধি গেছে। কোনো রোগী সেখানে পয়সা খরচ করে না। চাইলেও সে খরচ করতে পারে না।

এটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্যাঙ্কে কত পুঁজি আছে সে হিসাব বাদ দিয়ে প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর সামনেই সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থার দরজা খোলা আছে। রোগীর প্রয়োজন অনুসারে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা, নার্স, হাসপাতালের জায়গা পাবার অধিকার, চিকিৎসা, পথ্য ও সব রকম সেবাযত্ন সরবরাহ করা হয়। এ সব বিক্রীর সামগ্রী নয়। যদি কেউ এ সব কিনবার চেষ্টা করে তো তাকে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ বলে গণ্য করা হয়। কারণ একটা মানুষের জীবন কিনবার সামর্থ আছে কার? রাশিয়ায় স্বাস্থ্যের সমস্যা হল এতই সহজ।

অজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানের পথে

জারের আমলে রুশ সৈন্যবাহিনী ছিল জনসাধারণের ঘৃণা ও ভয়ের পাত্র। বাধ্যতামূলক সামরিক কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা বহু বছরের মত শ্রেষ্ঠ রুশ তরুণদের ঘরবাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন করে জঘন্য অবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য করত। পুরুষেরা ও তাদের পরিবারবর্গ এই ব্যবস্থাকে সাংঘাতিক নির্বাসনের সামিল মনে করত। দুঃসহ চোখের জলের মধ্যেই তারা নিত বিদায়।

পুরানো রাশিয়ার সৈনিকের ভাগ্য ছিল এই—তার ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হত, বহু বছর সে স্ত্রী বা পিতামাতার সঙ্গে দেখা করতে পেত না, পদস্থ কর্মচারীরা তার চিঠিপত্রের পরে কড়া নজর রাখত, সে খবরের কাগজ পড়তে পেত না, অসামরিক জনসাধারণের সঙ্গে তাকে মিশতে দেওয়া হত না, সাংঘাতিক চাবুকের মত আরো অনেক রকম বর্বর শারীরিক শাস্তি তাকে দেওয়া হত, অসদ্‌ব্যবহারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জানাবার কোনো উপায় ছিল না। উপরওয়ালা কর্মচারীদের এরা "ইওর এক্সেলেন্সি" বলে সম্ভাষণ করত। তারা ছিল সব অভিজাত বংশের আঁস্তাকুড় থেকে কুড়োনো। তবু সাধারণ সৈন্যদের তারা গরু ভেড়ার সামিল মনে করত।

এর পর রুশ সৈন্যরা যে প্রথমেই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল তাতে অবাক হবার কিছু আছে কি?

বিপ্লবের সময় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আমূল অদলবদল দেখা দিল। এই পরিবর্তন যখন এল তখন রাশিয়ার জনগণ মহাযুদ্ধের চার বছরের

বিভীষিকার পরও হাজারে হাজারে এগিয়ে এল নূতন বাহিনী লাল ফৌজের স্বেচ্ছাসৈনিক হতে।

কিন্তু ইতিহাস লিখতে আমরা বসিনি। সাম্প্রতিক কাল নিয়েই আমাদের কাজ। হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করার আগেও রাশিয়ার বিরাট সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী প্রস্তুত হয়েছিল। এতে যোগদান ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু কি বিপুল পার্থক্য এর আগের সঙ্গে! নূতন নূতন দলের যখন ডাক পড়ত অসংখ্য পরিবারে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হত, লোকের ভীড় জমতো যে তরুণরা সগর্বে কর্তব্য পালন করতে যাচ্ছে তাদের উপর উপহার বর্ষণ করতে। "ইওর এক্সেলেন্সির" যুগ আর নেই! লাল ফৌজের অফিসারেরা উৎসবে যোগ দিতেন। নিরীহ বৃদ্ধ চাষীরা যাদের মন থেকে জারের আমলের সৈন্যবাহিনীর গ্লানিময় বছরগুলোর কথা তখনও মুছে যায়নি তারাও আসত নূতন অফিসারের সঙ্গে হাত মেলাতে, একসঙ্গে খানাপিনা করতে।

জারের আমলে সৈন্যবাহিনীর নীতি স্বল্প কথায় এইভাবে বলা যায়—বর্বর নির্বুদ্ধিতা। লাল ফৌজের পিছনকার নীতি হল "বিজ্ঞানের গোপন হাতিয়ার ব্যবহারের শিক্ষানবীসি। শিখবে কে? মানুষ। তাই মানুষই হচ্ছে—প্রতিটি সৈন্যই হচ্ছে লাল ফৌজের প্রথম ও শেষ কথা। অনেক দিন আগেই লাল পল্টনের সেনারা যাতে দুনিয়ার সেরা সৈনিক হয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সে সমস্যা নিয়ে কাজে লাগা হয়েছিল। দু ভাবে এ সমস্যার সমাধান হল।

প্রথমত, নূতন শৃঙ্খলাবোধ। এর ভিত্তি হচ্ছে সার্জেণ্ট থেকে জেনারেল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উচ্চপদস্থের কর্তৃত্বস্বীকার। কিন্তু এই উচ্চ-পদস্থেরা অর্থাৎ অফিসারেরা শুধু এক উপায়েই কর্তৃত্বের পদে পৌঁছতে

পারেন—সাধারণ সৈনিক হিসাবে যথাযথ কাল কাজ করার পর অফিসারদের স্কুলে ঢোকা। প্রত্যেক অফিসার একদিন ছিলেন সৈনিক, প্রত্যেক সৈনিক একদিন অফিসার হতে পারে।

আর লাল ফৌজে আশ্রিতবাৎসল্যের স্থান নেই! কুল, মর্যাদা, টাকা, শিক্ষা বা রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠা কোনো কিছুর জোরেই একজন যুবক বেসামরিক জীবন থেকে এক লাফে লাল ফৌজের অফিসারের 'মেসে' ঢুকতে পারে না। আবার চামড়ার রং, পিতামাতার জাতি, পাঁচ আঙুলে সহজ পরিশ্রমের চিহ্ন কিম্বা বলরুমে নাচের আসরে বা মদ্যপানে উৎসাহহীনতা—এ সব কোনো কিছুর অজুহাতেই কোনো সৈনিককে লাল ফৌজের অফিসারদের স্কুল থেকে দূরে রাখা সম্ভব নয়। ঐ স্কুলে ঢুকবার প্রার্থী হতে হলে প্রত্যেককে সেনাবাহিনীতে সাধারণ সৈনিক হিসাবে কাজ করার নির্দিষ্ট কাল কাটাতে হবে, সামরিক দক্ষতা দেখাতে হবে, প্রমাণ করতে হবে সাহসিকতা, জয় করতে হবে সহকর্মীদের আস্থা আর শিখবার জন্য আগ্রহশীল হতে হবে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে অফিসারদের স্কুলকে "নেতৃত্বের জন্য অভিজ্ঞ কর্মী সৃষ্টির স্কুল" বলা হয়। এ থেকে বোঝা যায় কি ভাবে 'অভিজ্ঞ কর্মীর' জন্য স্টালিনের আবেদন লাল ফৌজের মনেও সাড়া জাগিয়েছিল।

শৃঙ্খলা অটুট রাখার দায়িত্ব শুধু অফিসারদের নয়। এর জন্য সৈন্যদেরও তিন রকম শৃঙ্খলা রাখার দল আছে—কোম্পানী সভা (যেখানে সৈনিকরা নিজ নিজ অসুবিধার কথা আলোচনা করে), বেয়াড়াদের শৃঙ্খলা মানাবার জন্য ঐ সভায় নির্বাচিত "সহকর্মীদের বিচার সভা" ও সবশেষে অফিসার। খুব কম ব্যাপারই অফিসারদের কাছ অবধি গড়ায়। সে ক্ষেত্রেও সৈনিককে তাদেরই সামনে দাঁড়াতে হয় যারা সাধারণ

সৈনিক থেকেই উপরে উঠেছে। বেয়াড়া সৈনিক লাল ফৌজের মর্যাদা রাখছে না এই হল তাদের মনোভাব। সৈনিকেরা অফিসারদের নিজেদের মত মানুষ বলেই ভাবে। ওদের ছাড়িয়ে তারা উপরে উঠেছে শুধু দেশাত্মবোধ, দক্ষতা, কঠোর অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার জোরেই।

এই সব কিছু মিলে লাল পল্টনে এক নূতন ধরনের শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠল। অন্য দেশের সামরিক দ্রষ্টারা এ দেখে অবাক হলেন। তাঁদের ধাঁধাঁ লেগে যায়। আসলে বিজ্ঞানের হাতিয়ার ধরবার উপযুক্ত সৈনিক গড়বার পথে এ হল প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়ত, নূতন সৈন্য জীবন। লাল ফৌজের শিক্ষার পাঁচটি লক্ষ্য আছে ঃ—তাদের রাজনৈতিক, নীতিগত, সাংস্কৃতিক, দৈহিক ও সামরিক উন্নতি।

আমাদের দেশে সৈন্যবাহিনীতে রাজনীতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সৈনিকদের নৈতিক জীবনের দায় সঁপে দেওয়া রয়েছে পাদ্রীদের হাতে। আমরা জানি পাদ্রীরা যতই আন্তরিক চেষ্টা করুক না কেন এ ব্যবস্থা কি ভাবে বানচাল হয়। মায়েরা অনেক সময়ই দেখেন ছেলেরা ক্রমশ দুর্নীতি ও মাতলামির পথে পা বাড়াচ্ছে আর আমরা এ সব “সৈনিক জীবন” বলে উপেক্ষা করি। আমাদের সৈন্য তালিকাভুক্ত লোকগুলির শিক্ষার জন্য সামান্য একটু চেষ্টা হয়—তাদের সাংস্কৃতিক জীবনও স্বল্পপরিসর। শুধু শারীরিক ও সামরিক শিক্ষা আমাদের দেশে বেশ ভালোভাবেই চলে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সৈনিকদের পক্ষে রাষ্ট্রনীতি একান্ত দরকারী মনে করা হয়। লাল পল্টনে নীতিপরায়ণতা খুব মস্ত সমস্যা নয় শুধু এই জন্যই যে সৈনিকজীবনকে সেখানে পারিবারিক জীবনের মত

করে তুলবার যথাসাধ্য চেষ্টা হয়। তাই প্রাত্যহিক একঘেঁয়ে কাজের প্রাণহীনতা থেকে সেখানে "মুক্তির" প্রয়োজন হয় না। (এ দুটি প্রসঙ্গ আমরা পরে আবার আলোচনা করব) সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ যা হয় তা আমাদের কল্পনারও বাইরে। শান্তির সময় লাল ফৌজের ৩০,০০০ সংস্কৃতিসদন, ৩,০০০ সেনানিবাসের ক্লাব ও ২,০০০ শাখা ক্লাব ছিল। সেনাবাহিনীর গ্রন্থাগারে ছিল আড়াই কোটির উপর বই। প্রত্যহ সৈন্যদের ১৭,২৫,০০০ খবরের কাগজ ও প্রতিমাসে ৫ লক্ষ সাময়িক পত্রিকা দেওয়া হত। সৈন্যদের দেশের সব থেকে ভালো অভিনয়, অর্কেষ্ট্রা, ফিল্‌ম দেখবার জন্য প্রতি বৎসর কোটি কোটি ডলার ঢালা হত আর প্রতি শিবিরে আসতেন বিখ্যাত অভিনেতা, গায়ক, লেখক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীরা। এঁরা সৈনিকদের সঙ্গে মিশবার এবং অতীত ও বর্তমানের বিপুল ঐশ্বর্যের দ্বারা তাদের অনুপ্রাণিত করবার সুযোগ পেয়ে নিজেদের সম্মানিত বোধ করতেন। এর উপর প্রায় অর্ধেক সৈন্য সর্বদাই অফিসারদের স্কুলে ঢুকবার জন্য পড়াশুনা করত। ১৪টি বিদ্যায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০,০০০ অফিসার শিক্ষা করতেন।

লাল ফৌজের শিক্ষার পর আর একটি বরাবরকার মূল নীতি হচ্ছে শহরে ও কৃষিক্ষেত্রে বেসামরিক জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা। এই সহযোগিতা যে একটা সচেষ্ট উদ্যম প্রসূত নয় অফিসার ও কমিশার ব্যবস্থারই ফল—এই ভাবে ব্যাপারটিকে দেখলেই ঠিক হবে। সমস্ত নেতারা আসেন সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে থেকে, কারখানা ও চাষের ক্ষেতে যারা হাত বা মাথা চালায় তাদের ভিতর থেকেই আসে সৈনিকেরা। তাই সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই। এই যুদ্ধে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগ বিরাটভাবেই দেখা

গেছে। ডিভিশনকে ডিভিশন লাল ফৌজের সৈন্য ক্ষেতে কাজ করেছে, যে সব জায়গায় আক্রমণ আসন্ন সেখানে শস্য কাটবার জন্য এগিয়ে এসেছে। আবার সরবরাহের যখন অত্যন্ত প্রয়োজন তখন অসংখ্য চাষী সমস্ত শস্য নিয়ে ফ্রণ্টে এসে উপস্থিত হয়েছে। শহরে সৈন্যবাহিনী ও বেসামরিক জনসাধারণ আত্মরক্ষার প্রস্তুতি ও নাৎসী বোমা কামানের নাগালের বাইরে শিল্পের যন্ত্রপাতি অপসারণের জন্য বার বার একত্রে কাজ করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে একমাত্র য়ুরোপীয় দেশ যেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হলে "গণবাহিনীর" কথা ওঠেনি। লাল ফৌজ চিরকালই গণবাহিনী। জনগণের মধ্যেই এর জন্ম, জনগণের সেবাই এর লক্ষ্য, জনসাধারণও আন্তরিকভাবে এর সঙ্গে সহযোগিতা করে। আর প্রত্যেক সৈন্য জানে এ কথা। সে জানে জনগণই লাল ফৌজকে সৈন্য যোগায়— অশেষ দৃঢ়সংকল্প ও আত্মত্যাগের দ্বারা তারাই ফ্রণ্টকে সাহায্য করে।

সোভিয়েট লেখক, এরেনবুর্গের ভাষায় "আমাদের লাল পণ্টনের সেনারা জানে তারা কি রক্ষা করছে। তারা রক্ষা করছে পৃথিবীর তরুণতম দেশকে, তারুণ্যের দেশকে। আমরাই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম গড়েছি এক সমাজ যা লোভের পরে প্রতিষ্ঠিত নয়—যার প্রতিষ্ঠা শ্রমনীতির পরে, সৃষ্টিশীল কাজের পরে, মানুষের ঐক্যবোধের পরে।...আমাদের তারুণ্য লড়ছে আমাদের দেশ, আমাদের স্বাধীনতার জন্য কিন্তু তারা বিশ্বের মুক্তির জন্য মনুষ্যত্বের মর্যাদার জন্যও লড়ছে। তারা লড়ছে প্যারিসের দাবীর জন্য, প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, দৃপ্ত নরওয়ে, সার্বদের কুটির ও এ্যাক্রোপোলিসের জন্য।"

এই ভাবে রাশিয়ায় নূতন ধরনের এক সৈন্যজীবন গড়ে তোলা হল। কি করে হল তার মধ্যে কোনো রহস্য নেই। "ইওর এক্সেলেন্সিকে"

নির্মূল করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই, সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগের ফলেই তা হল। জার আমলের অফিসারদের নির্বুদ্ধিতার স্থান নিল বিজ্ঞান। এর সূত্রপাত একেবারে তলা থেকে কারণ সমগ্র জনগণের হাতে আজ এই নূতন হাতিয়ার।

আবার উপর থেকেও ঠিক এই ব্যাপারই হল।

রুশ বাহিনীর মাথা

হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করে তখন সোভিয়েট ইউনিয়নে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত, যোশেফ ই, ডেভিস সাধারণের কাছে ঘোষণায় বলেন যে লাল ফৌজ "দুনিয়াকে অবাক করে দেবে।" পরে তিনি বলেন "লাল ফৌজের সৈনিক ও অফিসারদের কৃতিত্ব যা জানি তা থেকে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এ হল এক আশ্চর্য সংগঠন আর যুদ্ধ এলে তার চমৎকার পরিচয় মিলবে। লাল ফৌজের আশ্চর্য কীর্তিকলাপ আমার আশাকেও ছাড়িয়ে গেছে—এর নেতৃত্ব অদ্ভুত কীর্তি অর্জন করে তার মিত্রদের পর্যন্ত অবাক করে দিয়েছে। এমন কি জার্মানদেরও এরা তাজ্জব করেছে। যন্ত্রকৌশলের দিক থেকে এ এক মস্ত বড় কীর্তি। সমরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পানৎসার আক্রমণ প্রতিহত করার নূতন পন্থা নির্ধারণ ও সংগঠনের মধ্যেকার প্রতিভা সোভিয়েট ফৌজের এক ঐতিহাসিক অবদান।"

বারবার এই প্রতিভা সারা বিশ্বকে চমৎকৃত করেছে। আমাদের বোঝানো হয়েছিল যে লাল ফৌজ হচ্ছে নেতৃত্ববিহীন বিশৃঙ্খল এক জনতা মাত্র। এই জনতাই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী—ভয়াবহ ব্লিৎসক্রীগ প্রতিহত করার উপযোগী একমাত্র বাহিনী বলেই প্রতিপন্ন হল।

এই বাহিনীর শীর্ষস্থানে আছেন একজন মানুষ অল্পলোকেই যার নাম শুনেছে। তিনি হচ্ছেন লাল ফৌজের 'চিফ অফ দি জেনারেল স্টাফ'—মার্শাল বোরিস মিখায়েলোভিচ্ শাপস্‌নিকভ্। এই প্রতিভা সম্পর্কে অনেক বই লেখা যায়। আমি শুধু দুটি কথা বলতে চাই।

জার বাহিনীর কর্ণলে শাপস্নিকভ্ বিপ্লবের গোড়া থেকেই যে সামান্ত কজন অফিসার সোভিয়েটের পক্ষে যোগ দেন তাঁদের অন্যতম। লাল ফৌজের হয়ে তিনি অবিশ্রাম লড়ে এসেছেন। আর একটি কথা হল এই যে জেনারেল হবার আগে শাপস্নিকভ্ ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক ও গণিতবিদ।

১৯১৯ সালে শাপস্নিকভ্ ছিলেন সমগ্র লাল ফৌজের 'চিফ অফ অপারেশন।" ১৯২১ সালে এই ভূতপূর্ব 'ইওর এক্সেলেন্সিকে' রক্ত পতাকাবাহীর সম্মান দেওয়া হল আর তাতে উল্লাসধ্বনি করল সমস্ত রুশজাতি। ১৯২৯ সালে তিনি 'চিফ অফ স্টাফ' হলেন। ১৯৩২এ অর্থাৎ স্টালিনের ভবিষ্যদ্বাণীর পরের বছর শাপস্নিকভ্ আধুনিক যুদ্ধ সম্পর্কে গোপনে কতকগুলি বক্তৃতা দেন।...এতে তার অন্যতম ছাত্র ছিলেন স্টালিন! কাজেই স্টালিন নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশেষজ্ঞের উপযুক্ত শিক্ষায় অর্থাৎ বৈজ্ঞানক সমরবিদ্যায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুললেন।

লাল ফৌজের বহু কীর্তিমান তরুণ জেনারেলই শাপস্নিকভের হাতে গড়া। তাঁর কাজের জন্য মার্শালকে ১৯৩৪ সালে 'অর্ডার অফ দি রেড স্টার' ও ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় অর্ডার দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালে তিনি 'অর্ডার অফ লেনিন' পান আর ১৯৪১ সালে তাঁর ষষ্ঠিতম জন্ম-বার্ষিকীতে তাঁকে আবার ঐ সম্মান দেওয়া হয়। তাঁর মতবাদগত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিভাই নাৎসী ও তাদের পেটোয়াদের বিরুদ্ধে লাল ফৌজের অভিযানের আশ্চর্য রণকৌশলের জন্য দায়ী।

সামরিক নেতৃত্ব সম্পর্কে শাপস্নিকভ্ তিন খণ্ড বই লেখেন। সমস্ত দুনিয়ায় এগুলি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। এর নাম হচ্ছে— 'সৈন্যবাহিনীর মস্তিষ্ক।" বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই বই-গুলিতে সর্বোচ্চ সমর পরিষদ গঠনের পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে।

হিটলারের সেনাপতিরা এগুলি আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলে। দুর্ভাগ্যক্রমে নাৎসীরা এর থেকে অনেকটা সুবিধা পায়। সৌভাগ্য বশত তারাও পুরোপুরি সুবিধা পায়নি কারণ শাপস্নিকভের বই লেখা হয়েছিল এমন এক সৈন্যবাহিনীর জন্য যার শুধু সর্বোচ্চ পরিষদ নয়, প্রত্যেক সৈন্যের হাতে আছে বিজ্ঞানের হাতিয়ার।

নাৎসীরা লাল ফৌজের বিজ্ঞাননিষ্ঠাকে উপহাস করত। রাশিয়া আক্রমণের সময় তারা কামানধারী অধ্যাপক অর্থাৎ সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে ঠাট্টাও করত যথেষ্ট। তারপর কিন্তু ঐ বাহিনী 'ব্লিৎস্ক্রীগ' বা তড়িৎ আক্রমণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে আরম্ভ করল। এরা তবে নিশ্চয়ই আশ্চর্য ধরনের অধ্যাপক। আজ সবাই জানে যে লাল ফৌজের গোলন্দাজবাহিনী দুনিয়ার সেরা—তার কাছা-কাছিও কেউ নেই। এর কারণ শাপস্নিকভ হাজার হাজার গণিতবিদকে একটি নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রয়োগ করতে শিখিয়েছিলেন। এর দ্বারা কামানের প্রথম গোলাতেই লক্ষ্যভেদ হয়— "ক্রমশ লক্ষ্যের দিকে এগোতে" হয়না—যা 'তড়িৎ যুদ্ধে' অচল।

আগেকার কালে সৈন্যবাহিনীকে অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হত; তার দেহ বিরাট কিন্তু মস্তিষ্ক অতি ছোট মাপের। কারণ পুরানো সৈন্যবাহিনীতে শুধু সর্বোচ্চ অফিসারদেরই চিন্তা করতে দেওয়া হত। শাপস্নিকভ এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে প্রত্যেক লাল ফৌজের সৈন্য যথাশক্তি তার বুদ্ধি খাটাতে পারে—যাতে প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের হাতিয়ারে সজ্জিত হয়।

মানুষ মাথা দিয়ে ভাবে। কিন্তু লড়তে গেলে আরো কিছু চাই। দুর্ধর্ষ সাহস চাই, লড়বার মত আদর্শ চাই আর চাই যুদ্ধের হাতিয়ার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান।

লক্ষ লক্ষ বীর

পূর্ব প্রান্তে লড়াই শুরু হবার কিছু পরে 'নিউইয়র্ক টাইমস'এ এক সাংবাদিকের রুশ সামরিক হাসপাতাল পরিদর্শনের এক বিবরণ প্রকাশিত হয়। তিনি শয্যাশায়ী এক তরুণ সৈন্যের কাছে এসে দেখলেন সে খুব কাঁদছে। দোভাষীর সাহায্যে তিনি ঐ সৈন্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। জানা গেল ফ্রণ্টে তার দলের গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে না পারায় সে কাঁদছে। নিজের জীবনের জন্য বিন্দুমাত্রও সে চিন্তিত নয়। সে শুধু চায় ফ্যাশিস্ট ধ্বংস করার জন্য স্টালিনের আবেদনে সাড়া দিতে। সাংবাদিক অভিভূত হলেন প্রচণ্ডরকম কারণ ঐ তরুণ সৈন্যের দুটি পা-ই নষ্ট হয়েছিল।

'বীর' শব্দটি লাল ফৌজ সম্পর্কিত বক্তৃতায় যত ঘন ঘন ব্যবহৃত হয় এমন আর কিছুতে নয়। রাজনীতিবিদ, সম্পাদক, সাংবাদিক, প্রত্যেক দেশের নরনারী 'বীর লাল ফৌজের' কথা বলেন। এমন কি নাৎসীরা পর্যন্ত সোভিয়েট শৌর্যে অবাক না হয়ে পারে না।

মিঃ ডেভিস বলেন ঃ "সব থেকে বড় কথা হল সোভিয়েট ইউনিয়নের, তার মহান নেতা স্টালিন, তার লাল ফৌজ ও প্রত্যেক নরনারীর অদম্য প্রাণশক্তি—যারা কিছুতে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়ে না—প্রত্যেক পরাজয়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে যারা সেই শক্তিই অর্জন করে যা নিয়ে তারা আবার এগোয়—ক্রমাগতই এগিয়ে চলে। ডানকার্কের শৌর্যের পাশে এও হল এক জিনিস যা এই ভয়াবহ যুদ্ধই আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে—এই জ্ঞান যে এমন নরনারী আছেন যাঁরা অন্য নরনারী ও শিশু

যাতে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে তার জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মধ্যে গরিমা খুঁজে পান।”

যদি বলা যায় যে রাশিয়ায় সাহস জিনিসটাকে একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যা হিসাবে দেখা হয়েছিল তবে তাতে সোভিয়েট বীরদের গৌরব লাঘব হবে না। অবশ্য নাৎসীরা যে ভাবে তাদের সৈন্যদের উত্তেজক ঔষধ পত্র খাওয়াত বা অর্থহীন রক্ত লোলুপতায় উন্মত্ত করত সে ভাবে নয়। লাল ফৌজকে সাহস যোগান হয়েছিল উৎসাহ দিয়ে। প্রত্যেককে কি নিয়ে সে লড়ছে ও কেন সে লড়ছে অনবরত এই দুটি কথা ভালো করে বুঝতে উৎসাহ দেওয়া হত।

বহু বছর ধরে এই উৎসাহ দেবার কাজ চলেছে “রাষ্ট্রনৈতিক কমিশার” বলে এই পরিচিত লোকদের অবিশ্রাম চেষ্টায়। অনেক দিন আগে রুশ নেতা লেনিন সহজ ভাষায় এদের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে “কমিশার বাদ দিয়ে আমরা লাল ফৌজ পেতাম না।”

এই কমিশাররা কে ?

এরা ছিল সৈনিক যারা আপন আপন সামরিক কর্তব্য—যেমন গোলন্দাজ, গাড়ীচালক, পাইলট, সেনাপতি ইত্যাদির কাজ সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছে। সাধারণ সৈনিক হিসাবেই হোক বা সেনাপতি হিসাবেই হোক কর্মশক্তির জন্য এরা ছিল শ্রদ্ধার পাত্র। সোভিয়েট সরকারের প্রতি গভীর আনুগত্যের ইতিহাস এদের প্রত্যেকেরই ছিল; আসলে স্টালিন এক সময়ে সৈন্যবাহিনীর কমিশার ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে যখন লাল ফৌজকে ব্যাপকভাবে গ্লানিমুক্ত করা হয় তখন এই কমিশারেরাই হিটলার রাশিয়ায় যে সব বিশ্বাসঘাতককে কিনে নিয়েছিল তাদের নাম প্রকাশ করে। আপনারা জানেন য়ুরোপে রাশিয়াই হল একমাত্র দেশ যেখানে পঞ্চম বাহিনীরা জঘন্য

বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগ পাবার আগেই ধরা পড়ে নিহত হয়েছিল। এ কাজ করেছিল এই কমিশারেরা। তারা এ কাজ না করলে লাল ফৌজ হয়ত বিপর্যস্ত হত—আর আমরাও হয়ত আজ পদানত হতাম হিটলারের।

এ কথাটাই আমাদের স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনার সময় "বিশেষজ্ঞরা" এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই সব থেকে বেশী হোঁচট খান। গোলমাল আরো বাড়ল ১৯৪২ সাল থেকে যখন লাল ফৌজে কমিশার ব্যবস্থা "তুলে" দেওয়া হল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে বিখ্যাত মার্কিন সামরিক সমালোচক মেজর-জেনারেল ফিল্ডিং এলিয়ট "দি আমেরিকান কোয়ার্টার্লি" পত্রিকায় ১৯৩৮ সালের সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা বলতে গিয়ে লেখেন যে হিটলারের জেনারেল স্টাফ সম্ভবত "টুখাচেভস্কি যে কমিশার নিয়োগের ব্যবস্থা প্রায় নষ্ট করেছিলেন তার পুনর্প্রবর্তনের সংবাদে মস্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন।" কিন্তু শীঘ্রই জানা গেল যে টুখাচেভস্কি ছিলেন লাল ফৌজের মধ্যেকার জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতক আর তিনি কমিশার ব্যবস্থা নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এই জন্যই যে কমিশারেরা তাঁর বিশ্বাসঘাতক অনুচরবৃন্দের ষড়যন্ত্র প্রায় উদ্ঘাটিত করে ফেলেছিল। মস্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা দূরে থাকুক হিটলারের দুশ্চিন্তা এতে ভীষণ রকম বেড়ে গেল। এক বৎসরের মধ্যেই সে সোভিয়েটের সঙ্গে বিখ্যাত অনাক্রমণ চুক্তির জন্য কথাবার্তা শুরু করল।

রাশিয়ার ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন, বিচার ও অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে আমাদের, পত্রিকা ও বক্তারা অনেক কথা বলেছিলেন। কিন্তু কেউই কমিশারদের কথা এতটুকুও তোলেননি। কিন্তু এই কমিশারেরাই লাল ফৌজের সজীবতা

রক্ষা করে—এরাই কুইশলিংদের পাঠায় চরম শাস্তির মুখে—এরাই স্টালিন নয়—হিটলারকে বাধ্য করে চুক্তির জন্ম চেষ্টা করতে। কমিশাররা রাশিয়াকে বাঁচায়—আমাদেরও বাঁচায়।

অবশ্য বিদেশীদের গুপ্তচর বা দালালদের তল্লাস করাই কমিশারদের প্রধান কাজ নয়। তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল আপন দৃষ্টান্ত দিয়ে সমস্ত সৈনিকদের দেখানো যে আধুনিক যোদ্ধাকে তার নিজের অস্ত্র পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত করতে হবে আর শত্রু পক্ষের কৌশল পুরোপুরি বুঝতে হবে। সৈনিককে এর চেয়ে বেশী আর কোনো জিনিস আত্মবিশ্বাস যোগায় না। কিন্তু কমিশারদের আরো একটা দরকারী কাজ ছিল। এক সময়ে সৈনিকদের শুধু যে অফিসারদের মানতে হত তা নয়—অন্ধভাবে মানতে হত—কি কারণে হুকুম জারী হচ্ছে তার কারণ না জেনেই হুকুম তামিল করতে হত। এক বিখ্যাত কবিতার লাইনই তো আছে "কেন প্রশ্ন করার কথা তাদের কাজ নয়—তাদের কাজ করা ও মরা!" লাল ফৌজে কমিশারেরা এই মনোভাবটাই সম্পূর্ণ দূর করল। প্রত্যেক বড় যুদ্ধের আগে, প্রত্যেক সামরিক কৌশল প্রয়োগের আগে, প্রতিটি ছোটখাটো আক্রমণ, খোঁজখবর নেবার দল পাঠানো বা বোমা ফেলার আগে কমিশারেরা সকলকে এ সবের কারণ বুঝিয়ে দিতেন।

সংক্ষেপে এখানে কমিশারদের অন্যান্য কর্তব্যের কথাও বলা হল। স্টালিনের ভাষায় "সেনাপতি যেমন একটি রেজিমেণ্টের মাথা, কমিশাররা তেমনি ঐ রেজিমেণ্টের পিতা বা অন্তরাত্মা।" কিন্তু কমিশারের যথাসাধ্য সেনাপতিকে সাহায্য করা—যাতে তাঁর কর্তৃত্ব দুর্বল না হয়ে দৃঢ়তর হয় তার চেষ্টা করা। সৈন্যরা জানত যে সমস্ত অফিসারদের সামরিক দক্ষতার কথা বা সর্বোচ্চ অফিসারেরো নৈতিক সাহসের অভাবের

কথা কমিশার তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করবেন। এও তারা জানত যে নির্ভীকতা, স্থৈর্য, কর্মোদ্যোগ ও ভালো রকমের লড়াই কমিশারের চোখ এড়াবে না ;—তিনিই দেখবেন যাতে উপযুক্ত লোকের পদোন্নতি ঘটে।

এই কমিশার ব্যবস্থার একটি আশ্চর্য বৈশিষ্টও ছিল এই যে এদের নিয়োগ করা হত সাধারণ সৈনিকদের নয়—অফিসারদেরো, এমন কি সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষকেও সাহায্য করতে! রুশ ফ্রণ্টে মার্কিন ও বৃটিশ সাংবাদিকেরা লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রত্যেক অফিসারের এক অচ্ছেদ্য সঙ্গী হচ্ছে এই কমিশার। কোনো হুকুম জারীর সময় দুজনেরই সই লাগে। এভাবে কাজ বাড়ানো হয় কেন ?

এর জবাব খুব সহজ। সামরিক বিশেষজ্ঞ স্বভাবতই লক্ষ্যবস্তু, শত্রুর সামর্থ, রিজার্ভ, অস্ত্রসজ্জা প্রভৃতি সামরিক প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামান। কমিশারের কাজ হল প্রত্যেকটি পরিকল্পনা দেখা, সব দিকে নজর দেওয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া। বিশেষ করে মানুষের দিকটায় ছিল তাঁর জোর নজর। কমিশাররা অত্যন্ত সযত্নে সৈন্যদের জীবন রক্ষা করতেন। শুধু সামরিক কৌশল দেখাতে বা বিশেষ লক্ষ্য ভেদের জন্য অনর্থক রক্তক্ষয়ে তাঁদের সম্মতি পাওয়া যেত না।

লাল ফৌজের রণকৌশলের সব থেকে আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখান মার্শাল সেমন টিমোশেঙ্কো—ফ্যাশিস্ট তাঁবেদার রাষ্ট্র ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভার গ্রহণ করার পর। ইতিহাসের সব থেকে বড় সামরিক কীর্তির অন্যতম এটি। ১৯৪০-এর গোড়ার দিকে টিমোশেঙ্কো সোভিয়েট সীমানার পিছনে ফিনল্যাণ্ডের ম্যানারহাইম লাইনের পূর্ণাঙ্গ ও হুবহু একটা নকল দুর্গ বানান। এটির পরেই মাসের পর মাস লাল ফৌজ মহড়া চালায়। টিমোশেঙ্কো ও তাঁর কমিশারেরা যখন

আসল ম্যানারহাইম লাইন স্বল্পতম জীবনপাতের মূল্যে অধিকার করা যাবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন তখনই শুধু সত্যকারের অভিযান শুরু হল। এই পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে শুধু যে অনেক প্রাণই বাঁচল তা নয়। উপরন্তু আক্রমণ আরম্ভ হবার পর অতি শীঘ্র লাইনটি পর্যুদস্ত ও অধিকৃত হল। লাল ফৌজ যে ফিনিশ ফ্যাশিস্টদের কয়েক সপ্তাহে হারাতে পারেনি তার কারণ এই।

ইতিহাসের প্রত্যেক বিখ্যাত সৈন্যবাহিনীই নিজেকে সব থেকে বেশী সাহসের অধিকারী বলে দাবী করেছে। এই প্রথম রুশেরা বাহিনী গড়ল সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সাহসকে নয়—প্রতিটি সৈন্য, প্রত্যেক মানুষের সাহসকে কেন্দ্র করে। বৈজ্ঞানিকভাবেই এ কাজ করা হল। ১৭৯০ সালের ফরাসী বিপ্লবের সময় উদ্ভূত সৈন্যবাহিনীতে কমিশার নিয়োগ প্রণালী তারা গ্রহণ করল। বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত কমিশারদের আপন আপন দিকে বিশেষজ্ঞ করে তুলে রুশেরা সমগ্র সেনাবাহিনীর রূপই দিল বদলে। কমিশারদের বানানো হল এক নূতন ধরনের অফিসার। তারা আসল অফিসারদের জায়গা অবশ্য জুড়ল না। লাল ফৌজের বিশেষত্ব হল এই যে এতে রইল দু দল অফিসার— এক দল চালাত সামরিক কাজের ধারা—অন্য দল পরিচালিত করত মানুষদের। আসল অফিসারেরা রক্ষা করতেন সেনাবাহিনীকে—আর কমিশারেরা রক্ষা করতেন মানুষকে।

এর মানে এই নয় যে কমিশারেরা পিছিয়ে থাকতেন। মোটেই নয়। জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর প্রথম প্রচণ্ড অভিযানের মুখে তাঁরাই সেনাপতিদের আশ্বস্ত করলেন যে সোভিয়েট সৈন্যরা 'অসম্ভবকেও' সম্ভব করতে পারে। নিজেদের বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁরা সৈন্যদের দেখালেন যে 'ব্লীৎস' বা তড়িৎ আক্রমণের ভয় আসলে অনেকটাই শুধু

ভয়ই। ধীরতা ও জবরদস্ত প্রত্যাক্রমণের সাহায্যে সে আক্রমণ থামানো যায়।

অনেক সময় এই কমিশারই তাঁর লাল ফৌজ দলকে বলতেন যে সবাইকে শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে। কারোর পালাবার যো নেই, ফ্রন্ট পর্যুদস্ত হওয়া ঠেকানোর জন্য দলবিশেষের নিশ্চিহ্ন হওয়া প্রয়োজন। তখন সৈন্যেরা মৃত্যুকে রুখে দাঁড়াত। কিন্তু মরতে মরতেও তারা বুঝত, জানত, কেন তাদের মরতে হচ্ছে। একজন সৈন্য যখন ঠিক বুঝতে পারে কেন তার প্রাণ দেওয়া দরকার, যখন সে জানে যে অন্য সব পথ বন্ধ বলেই তার ডাক এসেছে চূড়ান্ত আত্মত্যাগের—তখন শত্রু হিসাবে সে অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়।

লাল ফৌজে কমিশারেরা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করত তবে সে পদ তুলে দেওয়া হল কেন? মস্কো যখন সম্প্রতি জানালো যে কমিশারের পদ আর রাখা হচ্ছে না তখন আমাদের কাগজে ও সাংবাদিক মহলে জোর হৈ চৈ পড়ে গেল। আমাদের বিশেষজ্ঞেরা প্রমাণ করতে চাইলেন যে কমিশার নিয়োগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে—কাজের উৎকর্ষের জন্যই এ ব্যবস্থা বাতিল করা হচ্ছে।

এর থেকে মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। কমিশারদের একটি পৃথক সামরিক শ্রেণী হিসাবে না রাখার সিদ্ধান্ত হল লাল ফৌজের প্রচণ্ড সংগ্রাম আর প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লব্ধ বহু অভিজ্ঞতারই ফল। এ সব লড়াইএ সেনাপতি ও কমিশার পাশাপাশি লড়েছিলেন; সমস্ত রকম সম্ভবপর অবস্থায় তাঁরা বিশালভাবে আধুনিক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারপর কি হল?

এর মধ্যে কমিশারেরা এতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন যে ছোট বড় যে কোনো ইউনিটের সমস্ত দায়িত্ব তাঁরা নিতে পারতেন। অনেক

সময়ই কোনো অফিসার হত হলে সে দায়িত্ব তাঁদের নিতেও হল। এদিকে আবার সত্যিকারের সামরিক অফিসারেরা কমিশারদের কাছে শিখলেন কেমন করে আশ্চর্যভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়—কেমন ভাবে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ কমিশারেরা সমরবিজ্ঞানী হয়ে দাঁড়ালেন আর অফিসারেরা হলেন রাষ্ট্রনীতিবিদ।

এই পারস্পরিক শিক্ষার জন্য দুই ধরনের অফিসারদের মধ্যেকার পার্থক্য কার্যত দূর হয়ে গেল। প্রত্যেকেই অন্যের কাজটা শিখে নিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে যা প্রায়ই হয়ে থাকে—দুটো 'বিরুদ্ধ' ধারণা থেকে একটি সংযুক্ত নূতন ধারণা উদ্ভূত হল। এক্ষেত্রে এই নূতন 'ধারণা' হল নূতন ছাঁচের লাল ফৌজ অফিসারের ধারণা যে অফিসার একই সঙ্গে কমিশার ও রণকৌশলী। এই অফিসারই হলেন প্রচণ্ড সোভিয়েট অগ্রগতির প্রাণ। এঁদেরই অল্পবয়স, আত্মপ্রত্যয়, দুর্ধর্ষ সাহস, দক্ষতা ও স্বজননিষ্ঠা আমাদের সাংবাদিকদের এতটা চমৎকৃত করেছে।

আসল কথা হল এই যে আজ যারা লাল ফৌজের নেতৃত্ব করছেন তাঁরা হলেন অফিসার-কমিশার। সাহসী সেনাদের এই নেতারা দুনিয়াতে 'বীর' শব্দটি সম্পর্কে এক নূতন ধারণা সৃষ্টি করেছেন। আশ্চর্য সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন এঁরা। সামান্য কয়েকজন মাত্র নয়—লক্ষ লক্ষ লাল ফৌজের সেনাদের এঁরা উদ্বুদ্ধ করেছেন।

একজন নাৎসী সাংবাদিক লেখে "রুশেরা মানুষ নয়। যখন মরে যাওয়াই স্বাভাবিক হত তখনও এরা লড়েই চলে। কিছুতেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না যে এদের শেষ লোকটিও সাবাড় হয়েছে।"

কয়েক সপ্তাহ পরে জনৈক রুশ সাংবাদিক লেখেন "এই যুদ্ধে এক নূতন ধরনের 'বীরের' উদ্ভব হয়েছে আমি যাদের নামকরণ করতে পারি 'স্টালিনগ্রাদের মানুষ'। এই মানুষ জানে যে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে দৃঢ়

থাকতে হবে। স্টালিনগ্রাদের মানুষের দ্বারা সংরক্ষিত কোনো জায়গা যখনই জার্মানরা অধিকার করতে পেরেছে তখনই তারা সেই মানুষকে তার কাজের জায়গায় মৃত অবস্থায় পেয়েছে। কোনো একজন বীরের নাম করা আমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু ডিভিশনকে ডিভিশন বীরের নাম আমি করতে পারি।"

এর কারণ শেষ মানুষটি অবধি প্রত্যেকেই মরণ পণ করে সজ্ঞানে, মৃত্যুর দিকে এগোত—আর শত্রুকে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য অসম্ভব মূল্য দিতে বাধ্য করত।

অবশ্য লাল ফৌজের আহত ব্যক্তিমাত্রই যে ক্ষতের তাড়নায় মারা যায় এমন নয়। বরঞ্চ সোভিয়েট মৃত্যুর স্বল্প হার আমাদের সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসক মহলেও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। ভিশনেভস্কির নেতৃত্বে রুশ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়ের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি অর্জন করেছেন।

আমরা আগেই দেখেছি সোভিয়েটের এক দেহ থেকে অন্য দেহে রক্ত দেবার পদ্ধতি কত উন্নত। যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবাহিনীর ডাক্তারেরা এদিকে আরো অগ্রসর হয়েছেন। এখন একেবারেই পুরোপুরি রক্ত না দিয়ে লাল ফৌজের চিকিৎসা পরিচালকেরা ধীরে ধীরে রক্ত দেন। শিরার মধ্যে তাজা রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে অনেকক্ষণ ধরে—এমন কি সমস্ত দিন ধরে দেওয়া হয়।

রক্ত দেওয়া ছাড়াও ডাঃ বোরিস কুদ্রিয়াশভ রক্তের মধ্যেকার একটি রাসায়নিক উপাদান যুদ্ধে প্রাণরক্ষার কাজে প্রয়োগ করার পদ্ধতি বার করেছেন। এই উপাদান হল থ্রম্বিন। সব দেশেই বিজ্ঞানীরা এর কথা জানতেন—এও জানতেন যে থ্রম্বিনই হল রক্তের ভিতরকার সেই জিনিস যার জন্য আপনা থেকেই রক্ত জমে গিয়ে ছোট ক্ষত থেকে

রক্ত পড়া বন্ধ হয়। কুড্রিয়াশভ বহুল পরিমাণ বিশুদ্ধ থ্রম্বিন পাবার উপায়ও আবিষ্কার করেছেন। এই দিয়ে সাংঘাতিক আহত লোকদের আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ অতি শীঘ্র বন্ধ করা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই রাসায়নিক উপাদান বহু পরিমাণে তৈরী করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই এই কৃত্রিম থ্রম্বিন পূর্ব সীমান্তে অসংখ্য জীবন রক্ষা করেছে। মাথায় সাংঘাতিক ক্ষতের সময় যখন বোমার টুকরো মগজে ঢুকে যায় তখন এটা আশ্চর্য কার্যকরী। এর সাহায্যে সোভিয়েট অস্ত্রচিকিৎসকেরা এমন সব মাথায়ও আভ্যন্তরীণ অস্ত্রোপচার করেছেন যা এ পর্যন্ত অসম্ভব মনে করা হত। রোগীর পরে থ্রম্বিনের প্রয়োগের ফলে কোনো খারাপ উপসর্গ দেখা দেয় না। যে সব ক্ষত থেকে এর সাহায্যে রক্ত পড়া বন্ধ করা হয় এর প্রয়োগে আসলে আবার তার থেকে রক্ত ক্ষরণ শুরু হয় না।

লাল ফৌজ সম্পর্কে সব শেষে আরো একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে হবে। এ হচ্ছে সেই সব লোক সম্পর্কে যারা সাংঘাতিক আহত হয়ে আর যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরতে পারে না—সারা জীবন পঙ্গু বা অসহায় অবস্থায় যাদের কাটাতে হবে। এদের জন্য কি করা হয়?

এভাবেও প্রশ্নটা তোলা যায়ঃ—যে সব বীরেরা স্বাধীনতার জন্য আপন দেহ বা মন বিলিয়ে দিল তাদের জন্য কি করা উচিত?

সোভিয়েট সামাজিক নিরাপত্তা সচিবের উত্তর খুব সোজা। লাল ফৌজ বা নৌবাহিনীর কোনো লোক যদি তার পুরানো কাজে ফিরে যাবার উপযুক্ত না থাকে তবে তাকে অন্তত তার পুরানো কাজের বেতনের সমান পেন্‌শন দেওয়া হয়। আসলে স্থায়ী পঙ্গুতার তারতম্য অনুসারে সাধারণত পেন্‌শন পুরানো বেতনের চেয়ে অনেকটা বেশীই হয়।

স্বভাবতই সম্ভব হলে খুব কম প্রবীণ ব্যক্তিই পেনশন নিয়ে আলস্যে দিন

কাটাতে চায়। এই কথা মনে রেখে লাল ফৌজ ও নৌবাহিনী থেকে পুনর্নিয়োগের জন্য বহু স্কুল ও হাসপাতাল খোলা হয়েছে। এখানে পঙ্গু লোকেরা তাদের স্বাস্থ্য ও অবস্থা অনুযায়ী কাজ শিখতে পারে। এই সব স্কুলে যে কাজ হয় সে কাজের জন্য—এমন কি অপটু শিক্ষার্থীদের কাজের জন্যও সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ থেকে টাকা দেওয়া হয়।

সোভিয়েট জন্মভূমির জন্য কোনো নরনারী যখন তাঁর দৈহিক স্বাস্থ্য বিসর্জন দেন তখন তাঁকে সাধারণ অসামরিক জীবনে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করবার সমস্ত চেষ্টা করা হয়। তা সম্ভব না হলে আজীবন এই আত্ম-ত্যাগীদের পুরানো জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার মত পেনশন দেওয়া হয়।

সমগ্র জাতির রণসজ্জা

অনেক বিশেষজ্ঞ রাশিয়ার শক্তির কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করেন ঃ—সোভিয়েট ইউনিয়নের মানুষ লড়ছে জন্মভূমি রক্ষার জন্য। তাই তারা জার্মানদের ঠেকাতে পারছে। কি মূঢ়তা! দুটি মাত্র দেশের কথা বলছি—পোল্যাণ্ড ও গ্রীসের জনগণও তো তাদের জন্মভূমি রক্ষার জন্য লড়েছিল। তারা তো পর্যদস্ত হয়ে গেল।

আরো অনেকে বলে রুশেরা আশ্চর্য রকম লড়ছে কারণ তারা তাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাচাচ্ছে। কিন্তু ওয়েক দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-সৈন্যরাও অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে লড়েছিল যদিও যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। রাজা ষষ্ঠ জর্জের জন্য লড়তে গিয়ে বৃটিশ ও কানাডিয়ান সৈন্য, নৌবাহিনীর লোক ও বৈমানিকেরাও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে।

রুশেরা তাদের জন্মভূমি বা সমাজতন্ত্র রক্ষা করছিল এই কথা বলে সোভিয়েট শৌর্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। নিশ্চয়ই এ সবেরও মস্ত প্রভাব রয়েছে। তবুও এই যুদ্ধে বারবার প্রমাণ হয়েছে যে যা কিছু গৌরবের, শ্রদ্ধার তার জন্য লড়াই করেও দেশের পর দেশ হিটলারী বর্বরদের পাশবিকতা, রক্তলোলুপতার কাছে হার মেনেছে।

হিটলার রুশেদের পর্যদস্ত করতে পারেনি। তারাই হিটলারকে গুঁড়িয়ে ফেলল। হিটলারের বিখ্যাত কালোকোর্তাবাহিনী শীতকাল মস্কোতে না কাটিয়ে রাশিয়ার প্রান্তরে পেল চির শান্তি।

রুশেরা যে তাদের প্রিয় মস্কোর জন্য—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের যা কিছু দিয়েছে তার জন্য লড়েছে—এ কথা ঠিক। কিন্তু লড়বার অস্ত্রও তাদের ছিল। আজব দেশ রাশিয়া থেকে যত ঘটনার কথা শোনা গেছে তার মধ্যে এর কাহিনীই হল সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপারগুলির অন্যতম।

১৫ বছর আগে রাশিয়া সাব্যস্ত করে সমগ্র জাতিকে অস্ত্রসজ্জায় সাজাবার। সামরিক, সরকারী ও বৈজ্ঞানিক নেতারা সযত্নে পরিকল্পনা রচনা করলেন। এই সামগ্রিক যুদ্ধের কেন্দ্রীয় সংগঠনের এত কটমট নামকরণ হল (ওশোয়াভিয়াখিম) যে আমরা তাকে বলব "সামাজিক আত্মরক্ষা"। ঠিক হল ব্যাপকভাবে এই আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গড়া হবে। তাই কর্তৃপক্ষ জনসাধারণেরই মত চাইলেন।

যা ঘটল অভিনবত্বের দিক দিয়ে তা একেবারে তাজ্জব। যুদ্ধের যখন প্রত্যক্ষ বিপদ নেই তখন সমস্ত দেশকে সামাজিক আত্মরক্ষার ব্যাপারে আকৃষ্ট করতে হলে প্রয়োজন খুব বেশী জনপ্রিয় আবেদনের। তাও পাওয়া গেল। কিন্তু প্রচার বা বক্তৃতা দিয়ে নয়—বরং বলা যেতে পারে মানুষের এক সর্বব্যাপী দুর্বলতায়—সব ছেড়ে জুয়াড়ী মনোবৃত্তিতে। বোধ করি সমাজতন্ত্রের আমলেও মানুষের মধ্যে ভাগ্য পরীক্ষা করার, কয়েক টাকা নষ্ট করতে রাজী থাকার—কিম্বা বিনা খরচায় দাঁও মারার চেষ্টার আশ্চর্য প্রবণতা থাকে।

জুয়ার দোষ সম্পর্কে নানা বাজে কথা লেখা হয়েছে। অন্য যে কোনো জিনিসের মত এও একটা পাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মাঝে মাঝে ঘোড়দৌড়ের টিকিট কিনতে চায়। রুশেরাও এ দিক থেকে কিছু ভিন্ন জাতের নয় একটি দিক ছাড়া। তারা ঠিক করল বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বসম্মত পথে জুয়াড়ী মনোভাবকে কাজে লাগাবে—জাতির উন্নতির জন্য।

তাই তারা শুরু করল 'সামাজিক আত্মরক্ষার' লটারী খেলা। প্রায় সবাই এর টিকিট কিনল। ১৯৪০-এর অঙ্ক আমার কাছে আছে। সে বছর 'সামাজিক আত্মরক্ষা' লটারী বিজয়ীদের পুরস্কার দেয় আড়াই কোটি রুবল। এর থেকে অনেক বেশী টাকা কর্তৃপক্ষের হাতে রইল। এ টাকা টিকিট বিক্রেতা, ঠক বা জুয়াচোরদের পকেটে গেল না—গেল "সামাজিক আত্মরক্ষার কাজে"।

'সামাজিক আত্মরক্ষা বিভাগ' তার বিপুল বাৎসরিক আয়ের সাহায্যে আত্মরক্ষার প্রচুর সরঞ্জাম কিনতে পারল। লটারী স্বভাবতই সকলের আগ্রহ উদ্রেক করল। ঠিক তেমনই করল আবার 'সামাজিক আত্ম-রক্ষার' প্রচেষ্টা! গত ১৫ বছর ধরে অবসর সময়ে ও ছুটিতে রাশিয়ার মানুষ সামাজিক আত্মরক্ষা লটারীর টাকায় কেনা সরঞ্জাম দিয়ে যা করল তার কিছুটা এবার বলি।

সত্যিকারের অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিনির্বাপকের কাজ, সেতু বাড়ী বোমায় উড়িয়ে দেওয়া, ডানপিটে কসাকদের মত ঘোড়ায় চড়া, বিরাট খোলা জায়গায় টেলিফোন বা রেডিও পরিচালকের কাজ, সত্যিকারের হাত বোমা ছোঁড়া, বেয়নেট চালানোর প্রতিযোগিতা, দিনের পর দিন জঙ্গলে কাটানো, বৈমানিকদের নজর এড়িয়ে লুকোচুরী খেলা, সমস্ত জেলা জুড়ে নিষ্প্রদীপের মহড়া আর সব থেকে বেশী এরোপ্লেন বানানো, সারানো, চালানো ও তার থেকে লাফিয়ে পড়া।

১৯৪০ সালে রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা প্যারাশুট স্তম্ভ থেকে ৫০,০০,০০০ বার লাফিয়ে পড়ে; বড়রা প্লেন থেকে লাফায় ১০ লক্ষ বার; হাজার হাজার ছোট বড়রা ছিল গ্লাইডার ক্লাবের সভ্য ও নভোচারিতায় অভিজ্ঞ। এ জিনিস সামাজিক আত্মরক্ষাও বটে আবার দুনিয়ার সব থেকে চমক-লাগানো খেলাও বটে! আমাদের

দেশে যখন ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখে সোভিয়েটের ছেলে মেয়েরা তখন, গ্লাইড করছে, উড়ছে—এমন কি প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ খাচ্ছে। এরোপ্লেন তারা পছন্দ করে, এরোপ্লেন তারা ব্যবহারও করে !

অবশ্য এ কথা বলতে চাই না যে রুশ পরিবার পিছু একখানা এরোপ্লেন আছে। মোটেই না। তবুও প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই অন্তত একজন লোক 'সামাজিক আত্মরক্ষার' কাজে নিযুক্ত আছে আর 'সামাজিক আত্মরক্ষা' ক্লাব পিছু একটা প্লেন আছে। এই প্লেনের মালিক সমগ্র জাতি। বয়স্ক, তরুণ বা অল্পবয়স্ক প্রত্যেকেই অবাধে এটা ব্যবহার করতে পারে। আমাদের বয় স্কাউট বা গার্ল গাইডের মত সোভিয়েটে যে সংগঠন আছে তার ছেলেমেয়েদের গরমের ছুটিতে এরোপ্লেনে বহু দূরে শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। শুধু তাই নয় ছুটিতে বেড়ানোর ব্যাপারটা 'মহড়ায়' পরিণত হয়—গন্তব্য স্থানে পৌছে তরুণেরা প্যারাশুটে করে শিবিরে নামে ! আমাদের দেশে আমরা পাকা বৈমানিকের পক্ষেও প্যারাশুটে লাফানো জিনিসটাকে বিপদজনক মনে করি। সোভিয়েট ইউনিয়নে স্কুলের ছেলেরাও প্যারাশুটের সঙ্গে পরিচিত।

'সামাজিক আত্মরক্ষা' রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে প্লেন ও প্যারাশুট লম্ফনের সঙ্গে পরিচিত করেছে। গল্প আছে মস্কোর এক ছেলে কয়েক শত সঙ্গীদের নিয়ে সুদূর এক কৃষি অঞ্চলে প্যারাশুট নিয়ে নামে। ছেলেটা ছিল খানিকটা চালিয়াৎ চন্দর ধরনের। সে নামল এক ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত বুড়ো চাষীর কাছে। সে হাসতে হাসতে বলল "খবর কি ঠাকুর্দা। এমন জিনিস যে 'তুমি কখনও দেখনি এ কথা আমি বাজী রেখে বলতে পারি !"

বুড়ো চাষী খাড়া হয়ে দাঁড়াল। চারিদিক দেখে থুতু ফেলল, তারপর বলল "নাতি এসেছিস গেল হপ্তায়। কিন্তু সে হল আরো ওস্তাদ। তোমার মত তার প্যারাশুট ঝোপে আটকায়নি। থামো, টান মেরো না, মস্কোতে কি প্যারাশুট কেমন করে সামলাতে হয় তাও শেখায় না?"

তারপর বুড়ো ছেলেটির প্যারাশুট পাট করতে করতে বলেই চলল "এ সপ্তাহে আমারও নীচু থেকে লাফাতে হবে। হয়ত আজ রাতেই 'সামাজিক আত্মরক্ষার' মাঠে গিয়ে আমি লাফাব অবশ্য যদি বৃষ্টি না হয়।" তারপর 'ঠাকুর্দা' ভুরু কুঁচকিয়ে শেষ করল "আর যদি মেশিনগান মহড়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়!"

রাশিয়ার লক্ষ্যভেদ সম্পর্কে একটা কথা বলি। লক্ষ লক্ষ বয়স্ক ব্যক্তি ও তরুণেরা একেবার 'সামাজিক আত্মরক্ষার' রাইফেল সংঘের সভ্য। গুলী ছোঁড়ার ও দেশে কি ভীষণ উৎসাহ তা বোঝা যায় এর থেকেই যে চার বছর আগে ৬০ লক্ষ গোলন্দাজ এ দিকে সেরা ওস্তাদীর জন্য বহু আকাঙ্খিত 'ভরোশিলভ' পুরস্কার পায়। প্রায় ১০,০০০ বয়স্ক লোক সবার সেরা অব্যর্থ সন্ধানের বাজী জেতে আর কোনো কোনো ওস্তাদের নাম জগৎ জোড়া। ১৯৩৯ সালে বৃটিশ রাইফেল ক্লাব সংঘ রুশ 'সামাজিক আত্মরক্ষা' দলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালায়। ফল হল এই যে ২১টি প্রথম স্থানের মধ্যে ১৮টি অধিকার করে সোভিয়েট ওস্তাদেরা। আর প্রথম পাঁচটি স্থান নেয় একটি রুশ দল 'সামাজিক আত্মরক্ষার কেন্দ্রীয় লক্ষ্যভেদী ক্লাব'। মস্কোর স্কুলের ছেলেরা নিউ ইয়র্ক ভ্যালি স্ট্রীমের দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ১,২০০-১,১১৫ পয়েণ্টে জেতে।

স্কি মহড়া ও ঘোড়ায় চড়ার দিকেও 'সামাজিক আত্মরক্ষার তালিকায়

ঐ একই রকম ভালো ফল দেখা গেল। রাশিয়ায় এই দুটি ব্যয়সাধ্য খেলার দরজা ছোটো বড় প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যবতীদেরই কাছে খোলা হল। স্কিয়িং ও ঘোড়ায় চড়া নিয়মিত লম্বা দৌড়, জঙ্গলের মধ্যে ঢোকা ও লড়াইএর খেলা প্রভৃতির সাহায্যে আরো চমকপ্রদ করে তোলা হল।

শান্তির সময় 'সামাজিক আত্মরক্ষা' এই সব করত। যুদ্ধের সময় কি করেছিল খবরের কাগজ থেকেই তা জানা যায়। সমস্ত রুশ জাতি ফ্যাশিস্ট দস্যুদের প্রতিহত করতে অগ্রসর হয়। কোনো কোনো পরিদর্শক বলেছেন : "বেসামরিক জঙ্গী দল ও গেরিলাবাহিনী যেন ইন্দ্রজালের মত চারিদিকে গজিয়ে উঠল।" ইন্দ্রজাল কিন্তু ছিল না কোথাও। বহু আগে সামাজিক আত্মরক্ষা এগুলিকে সংগঠিত করে— সমস্ত আন্দোলনে জাতীয় উৎসাহ যোগানোর উপযোগী জনপ্রিয় লটারীর সাহায্যে এর টাকা ওঠে।

রাশিয়ার নরনারী য়ুরোপীয় ভূখণ্ডের জনগণের মত নাৎসী দস্যুদের হামলার সামনে দৌড়ে পালায়নি। রুশদের দৃঢ় থাকার পিছনে অলৌকিক বা অতি-মানবিক কিছু নেই। তাদের বুকে ছিল সাহস। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আত্মরক্ষার শিক্ষাও ছিল তাদের মাথায়।

হিটলারের সেনাপতিরা স্বীকার করেছে যে রুশ গেরিলাবাহিনী বাড়তে বাড়তে প্রায় দ্বিতীয় ফ্রণ্টের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ার সাধারণ লোক এই লড়াই লড়তে পারে কারণ পনেরো বছর ধরে তারা শিক্ষানবিসী করেছে।

নূতন স্বাধীন পরিবার

ফ্যাশিস্ট বাহিনী যখন ইউক্রেনীয় জাতির দেশ প্রায় সবটাই মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছিল তখন রাশিয়ার ভিতরকার অঞ্চলে ইউক্রেনীয় বিজ্ঞান পরিষদের এক বিশেষ সভা হয়। এরই একটি অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি জিনিস যা আমাদের দেশে অত্যন্ত অদ্ভুত বোধ হবে। বৈজ্ঞানিকেরা সেদিন একত্র হয়েছিলেন মস্ত এক ইউক্রেনীয় কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। এই পংক্তি কটি থেকেই ইউক্রেনীয় পাঠকেরা কবিকে চিনতে পারবেন। বৈজ্ঞানিক বোগোমোলেট্স্ দণ্ডায়মান সশ্রদ্ধ সহকর্মীদের সামনে এগুলি পাঠ করেন :—

"সেই মহৎ স্বজন পরিবেশে
নতুন সুখী স্বাধীন ঘরে ঘরে
নাম আমার স্মরণে এলে, হেসে
বোলো সে কথা দরদী মৃদুস্বরে।"

এই কবি হলেন শেভচেঙ্কো, মানুষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও মুক্তি সাধক। সামগ্রিক যুদ্ধের নানান খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা এক কবিকে শ্রদ্ধা জানাবার সময় করতে পারলেন—কেমন করে এটা সম্ভব হল ?

শেভচেঙ্কোর জীবন ও কীর্তির মধ্যেই এর উত্তর মিলবে। তিনি ছিলেন সেই যুগের মানুষ যখন ইউক্রেন জারেদের কঠোর শাসনের চাপে ছিল অবসন্ন। ভূমিদাস ছিলেন তিনি। এই ভূমিদাসত্ব প্রথার পরে তাঁর

ছিল আন্তরিক ঘৃণা। তাঁর দেশের লোক নির্মম জাতিগত নিপীড়নের উপলক্ষ ছিল। শেভচেঙ্কো প্রচার করতেন বিভিন্ন জাতির ও দেশের ভ্রাতৃত্ব। ইউক্রেন ও পোল্যাণ্ডের পাশাপাশি সমস্ত রুশ দেশ যখন শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল তখন শেভচেঙ্কো তাঁর বিখ্যাত কবিতা "ককেশাস" রচনা করেন। এতে তিনি বলেন কি ভাবে 'মুক্তির অনির্বাণ শিখা' ককেশাস পাহাড়ের বরফে ঢাকা চূড়োতেও পৌছোনো হয়। "সমস্ত সম্রাটেরা আকণ্ঠ অশ্রু ও রক্ত পান করতে পারে কিন্তু জারতন্ত্রী ঈশ্বর মুক্তি-পিপাসুর উষ্ণ রক্ত কখনো নিঃশেষ করতে পারবে না!"

এই সব কবিতার জন্য শেভচেঙ্কোকে ভয় করত জার ও বড় বড় ভূস্বামীরা কিন্তু তাঁর আসন ছিল জনসাধারণের মনে। মৃত্যুর পরে তাঁর প্রভাব আরো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। বিপ্লবের পর সোভিয়েট সরকার যখন ইউক্রেনকে মুক্ত করেন তখন শেভচেঙ্কোর রচনার মস্ত মস্ত সংস্করণ প্রকাশিত হল আর সর্বত্র ইউক্রেনীয়রা সাগ্রহে তা পড়তে লাগল। হিটলারের চেলারা চেষ্টা করে এই জনপ্রিয়তা নষ্ট করবার। তারা শেভচেঙ্কোর কবিতার বিকৃতি ঘটায়। তারা রচনার খোল নলচে পালটাতে লাগল—উদ্দেশ্য ছিল কবিকে রুশ, পোল, ইহুদী প্রভৃতি অন্যান্য জাতি বিদ্বেষী ইউক্রেনীয় 'জাতীয়তাবাদী' বলে প্রতিপন্ন করা।

কিন্তু এ হল অত্যন্ত খেলো ধরনের মিথ্যাচার। শেভচেঙ্কোর সমস্ত জীবন ও কাব্যই এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় শেভচেঙ্কো একবার এক গ্রামে ছিলেন যেখানে হিটলারী ব্রাউন শার্ট সন্ত্রাসবাদীদেরই পুরানো সংস্করণ এক দল গুণ্ডাদের জারের চরেরা খুব ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। এরা গ্রামের ইহুদীদের পরে হানা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। শেভচেঙ্কো গোলমালের জায়গায় দৌড়ে গিয়ে দেখলেন অনেকগুলি বাড়ী তখনও ভীষণভাবে জ্বলছে। একজন যখন চীৎকার করে বলল যে

একটি জলন্ত কুঁড়ে ঘরে একজন বাচ্চাকে ফেলে আসা হয়েছে তখন কবি নিজে এগোলেন সে ঘরের মধ্যে আর বার করে আনলেন সেই জীবন্ত শিশুকে। সব সময়েই এই মহৎ ইউক্রেনবাসী তাদেরই ঘৃণা করতেন যারা তাঁর দেশবাসীকে ইহুদী-পীড়কে পরিণত করতে চাইত। বারবার তিনি এই কথাটাই প্রমাণ করেছিলেন যে যারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে তারা হচ্ছে ঠিক সেই অত্যাচারীরই দল যারা দাসত্বশৃঙ্খলে বেঁধেছে ইউক্রেনবাসীদেরও।

শেভচেঙ্কো রুশবিদ্বেষী ছিলেন এ কথা মিথ্যা। তিনি ঘৃণা করতেন শুধু জার, অভিজাতবর্গ ও সমস্ত স্বাধীনতার শত্রুদের। বিখ্যাত রুশ গণতান্ত্রিক চারনিয়েশেভস্কির সঙ্গে বহু বছর ধরে শেভচেঙ্কোর ছিল ব্যক্তিগত সৌহার্দ। এমন কি ইউক্রেনবাসীদের মধ্যেও যে সব নেতা জনগণের সত্যকার বন্ধু তাদের সঙ্গে অত্যাচারীদের অনুচরদের মধ্যেকার পার্থক্য তিনি স্পষ্টভাবেই দেখাতেন। যেমন তাঁর এক এপিক কবিতার নায়ক রুশ 'পিটার দি গ্রেটের' সঙ্গে যোগ দিয়ে হেটম্যান মেজেপপা নামে এক বিশ্বাসঘাতক ইউক্রেনবাসীকে পরাজিত করেন। আর শেভচেঙ্কো প্রশস্তি রচনা করেন বগডান খ্মেল্‌নিটস্কির যিনি সমস্ত জাতির স্বাধীনতার ভিত্তিতে ইউক্রেনবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেন তাদের রুশ ভাইদের সঙ্গে হাত মেলাতে।

ইউক্রেনীয় বিশ্বাসঘাতক, ভূস্বামী, হোয়াইট গার্ড আর সারা দুনিয়ায় তাদের ফ্যাশিস্ট সাঙ্গপাঙ্গরাই শুধু এই মহান কবির জার্মান বিকৃতি স্বীকার করে নিল। জার্মান বাহিনী যখন ঘৃণ্য ইউক্রেনীয় পঞ্চম বাহিনীদের সঙ্গে নিয়ে সোভিয়েট ইউক্রেনে ঢুকল তখন এই মিথ্যাচারের স্বরূপ প্রকাশ পেল। কারণ জার্মানরা তখন প্রায় ১০০ বছর আগে মৃত ব্যক্তির পরেই তাদের পাশবিক ঘৃণা চরিতার্থ করল।

তারা গেল শেভচেঙ্কোর কবরে যে কবর ইউক্রেনবাসীদের কাছে মন্দিরের মত পবিত্র—আর সেখানে গিয়ে জঘন্যভাবে অপবিত্র করল সে কবর। জার্মানরা এই অর্থহীন কাণ্ড করল কারণ তাদের ফ্যাশিস্ট হৃদয় পূর্ণ ছিল জাতি বিদ্বেষে। তারা সেই কবির স্মৃতি পর্যন্ত সহ্য করতে পারল না। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই দিনের যেদিন রুশ, ইউক্রেনীয়, পোল ও সমস্ত জাতির মানুষ ঐ নূতন ও স্বাধীন পরিবারভুক্ত হবে।

সব দেশেই ফ্যাশিস্ট ও তাদের দালালেরা জাতিবিদ্বেষের বিষ দিয়ে মানুষের সর্বনাশ ঘটায়। এ হল এক সনাতন পাপ—ইহুদীর বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান, রুশের বিরুদ্ধে পোল, ইউক্রেনিয়ানদের বিরুদ্ধে কসাক, সমস্ত কালোদের বিরুদ্ধে সমস্ত ধলা। শত শত বছর ধরে অত্যাচারীরা মানুষের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ পাছে বাস্তবে পরিণত হয় এই জন্য ছড়িয়েছে এই বিষ।

এই জাতিবিদ্বেষের ফলেই জার্মান জাতি হিটলারী ফাঁদে পা বাড়ায়। ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লোভিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়ার সর্বনাশ হয়েছে এরই ফলে। আজকেও ফ্যাশিস্ট ও তাদের দালালেরা আমাদের নিজেদের দেশেও এই বিষ ছড়াচ্ছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থাৎ য়ুরোপের ঠিক সেই অংশেই যেখানে শত শত বছর ধরে জাতিবিদ্বেষের আগুন জ্বলেছে—সেখানেই এক আঘাতে সমস্ত মানুষের মধ্যে থেকে এ পাপ ধুয়ে মুছে ফেলা হল।

পথ দেখালো বিজ্ঞান—অকাট্য বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দ্বারা এই কথা প্রমাণ করে যে জাতিগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বলে কোনো জিনিস নেই। সমান সুযোগ পেলে সব জাতিই সব দিক থেকে সমান। এর বিপরীত মতের স্বপক্ষে এক ফোঁটাও যুক্তি নেই। বিজ্ঞান কোনো ঘোর প্যাঁচ না করে আমাদের সোজা এই কথাই জানায় যে একটিমাত্র বিশুদ্ধ জাতি আছে —তার নাম মানবজাতি।

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তখন এই কথাটা পরিষ্কার করে বুঝতে চেষ্টা করলেন যে "মানব প্রকৃতির মধ্যেই" এমন কিছু আছে কি না যা জাতিবিদ্বেষের জন্ম দেয়। উত্তর হল—না। কিন্তু এই অনুসন্ধানের ফলে শীঘ্রই সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণ এই পাপের মূল আসলে কোথায় তা বুঝতে পারল। জাতিবিদ্বেষ ছড়িয়েছে ও এখনও ছড়াচ্ছে একই লোকেরা—জনসাধারণের শত্রুরা।

তাই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিপুল দেশের সমস্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় বলীয়ান হয়ে ঘোষণা করলেন যে, যে কোনো রূপেই হোক না কেন জাতিবিদ্বেষ প্রচার এখন থেকে হবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ।

অতি দ্রুত দুটো জিনিস দেখা গেল। প্রথমত ক্ষুদ্রমনা জাতিবিদ্বেষ প্রচারকেরা কাপুরুষের মত চুপ মেরে গেল। দ্বিতীয়ত জাতিবিদ্বেষ প্রচারের আসল উৎসগুলি বিচ্ছিন্ন ও উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল। মানুষকে যারা পশু বানাতে চায় উপযুক্ত শাস্তির সাহায্যে তাদের ব্যবস্থাও হল অবিলম্বে।

এই নীতি চালু হবার কয়েক বছর পর জাতিবিদ্বেষ আর সোভিয়েট ইউনিয়নে একটা সমস্যা হিসাবে রইল না। এটা হল এমন একটা মস্ত কাজ যে এ দেশে আমরা তার গুরুত্ব ধরতেও পারি না। নাম থেকেই বোঝা যায় যে ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক কয়েকটি সাধারণতন্ত্রের সমষ্টি। তার উপরে এটি হল ডজন খানেকেরও বেশী জাতির সমষ্টি—যার একটিমাত্র হল "রুশ"। কালো-ধলা-পীত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানুষের, স্বর্ণাভ 'আর্য' ও কৃষ্ণাভ 'ইহুদীদের' সমস্ত জাতির দেশ এইই। আজারবাইজান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, তুর্কমেন, উজবেক, তাজিক, কাজাক, কিরঘিজ প্রভৃতি নানা রিপাবলিকে সোভিয়েটের লক্ষ লক্ষ

লোক বাস করে যাদের নামও আমরা শুনিনি। এর মধ্যে প্রত্যেকটি দেশেরই স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা, বিভিন্ন ভাষা ও রীতিনীতি আছে। আরো অনেক জাতি আছে যেমন ভল্‌গার তাতার, ক্রিমিয়ার তাতার, বাস্কির, ইন্‌গাস্ক, অসেটিয়ান, এভেঙ্ক, আভার, লেজঘিয়ান ও চেচেনেরা। বিপ্লবের আগে এদের মধ্যে কয়েকটি জাতি ছিল আমাদের এস্কিমোদের মতই বন্য; সবাই ছিল জারের নীতির উপলক্ষ যা দাসদেশ মাত্রকেই নৃশংসভাবে শোষণ করত। দেশীয় ভাষায় স্কুল চালাবার অধিকার তাদের ছিল না। বিশেষ অনুমোদন ছাড়া তারা আপন দেশের বাইরে পা বাড়াতে পারত না।

সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল অসংখ্য ধর্মমতের অস্তিত্বের জন্য। বৌদ্ধ, মুসলমান, হিন্দু গ্রীক, খ্রীষ্টান, রোমান, ইহুদী, প্রটেস্টাণ্ট ও আরো বহু ছোটো খাটো ধর্ম ছিল।

তবুও সমস্যার সমাধান হল। সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে একমাত্র বিরাট দেশ যেখানে কোনো জাতিসমস্যা নেই। ১৮ কোটি লোক আর জাতি-বিদ্বেষের বিষে জ্বলে মরে না। ইউক্রেনের কবি শেভচেঙ্কোর স্বপ্ন রূপ পেয়েছে বাস্তবে। নূতন সোভিয়েট বিজ্ঞান জাতি সম্পর্কে মূলতত্ত্ব মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছে শেভচেঙ্কোর স্বপ্নকে কেমন করে বাস্তবে পরিণত করতে হয়।

ব্যাপারটা হল এইভাবে :—

প্রথমত সোভিয়েট সরকার প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির ভাষা, পুরানো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যে রক্ষা করতেই হবে এই মূল নীতি নির্ধারণ করল। দেশীয় ভাষায় স্কুল কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা, দেশীয় ভাষায় অসংখ্য বই ও পত্রিকা প্রকাশ, দেশীয় সাহিত্য, সংগীত, লোকগীতি, নৃত্য ও অপেরার জনপ্রিয়তা-সাধন প্রভৃতির সাহায্যেই এ কাজ করা হল। জারের আমলে এ সব

নিষিদ্ধ ছিল। সোভিয়েটের রাজত্বে জনগণকে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করবার জন্য প্রচণ্ডভাবে এ সবে উৎসাহ যোগানো হল।

দ্বিতীয়ত প্রত্যেক জাতিকে নূতন বিজ্ঞান, নূতন কৃষি, নূতন শিল্প এবং নূতন ও বিশিষ্ট জীবনযাত্রা প্রণালী এই সব নানা ধারায় নূতন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা হল। এইভাবে বহু জাতি কি করে তারা শক্তি অর্জন করল সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, বুঝতে পারে আগামীকাল জাতি হিসাবে কোন্ জিনিস তাদের প্রেরণা দেবে—যুদ্ধ নয়, দস্যুতা, লুণ্ঠন বা অন্য জাতির উপর শোষণ নয় বরঞ্চ শিল্প, সাহিত্য, কবিতা, গান, বিজ্ঞান, শ্রম, কৃষি ও নানা শৌর্যবীর্যের কীর্তি কাহিনী। এই নীতি ফলপ্রসূও হল। এমন কি ইউক্রেনবাসীরা জার আমলের শোষণ সত্ত্বেও যারা তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল—তারাও সোভিয়েট শাসনে জাতীয় চেতনা ও গৌরবে প্রচণ্ড রকম উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল।

তৃতীয়ত জার আমলের বর্বরতার ফলে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে সব জাতি তাদের ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির সূত্র হারাতে বসেছিল তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হল। শত শত বছর ধরে নিঃশেষ করার চেষ্টার ফলে যে সব জাত মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাদের অবস্থাও ছিল এই রকম। বিপ্লবের পরে এরা অন্য জাতির মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। সোভিয়েট সরকার কিন্তু এ রকম হতে দিল না। এই সব বিলীয়মান জাতিকে উদ্ধার করল—তাদের নেতারা নয় বরঞ্চ অধিকাংশ সময়েই সেই রুশেরাই যারা আগের দিনে নিজেরা ছাড়া অন্য সব জাতকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করত। এই হতভাগ্য জাতিরা মুক্তির আবহাওয়ায় আবার ধীরে ধীরে তাদের সংস্কৃতির গুপ্ত ধন পুনরুদ্ধার করল, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দেখল যে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্য সব জাতির আসরে

তাদেরও ডাক এসেছে। আর্মেনিয়ানদের সম্পর্কে এই কথা বিশেষ করে খাটে। গত ১০০ বছরে এরা অন্য যে কোনো জাতের চেয়ে বেশী দুর্গতি ভোগ করেছে। তুর্কীরা বড়াই করত যে আর্মেনিয়া আর নেই কারণ সেখানকার শেষ পুরুষ মানুষটিকেও হত্যা করা হয়েছে। আজ কিন্তু আর্মেনিয়ান জাতির আপন সোভিয়েট রিপাবলিক আছে, দ্রুত অগ্রগতির জন্য যার নাম সবত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

চতুর্থত সোভিয়েট ভাষাবিদেরা সমগ্র দেশ ঘুরলেন সেই সব আদিম জাতির সন্ধানে জারের আমলে পশুর মত শিকার করা হত যাদের। এদের অদ্ভুত কথাবার্তা ভালো করে চর্চা করে তাঁরা এদের জন্য লিখিত ভাষাও দাঁড় করাতে পারলেন। ইতিহাসে এই প্রথম তারা লিখতে শিখল, এক চারণ অন্য চারণকে যে সব লোক গাথা বা কাহিনী এতদিন দিয়ে যেত এবার সে সব তারা কাগজপত্রে লিখে ফেলতে শিখল। এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র প্রায় ডজন খানেক এই রকম জাতির গল্প ও গান প্রচলিত হয়েছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই কাজটির জন্য বিশেষ গৌরবান্বিত কারণ এর থেকে প্রমাণ হয়েছে যে "আদিম" জাতিরাও লিখিত ভাষা, বই, স্কুল ও স্বাধীনতা পেলে অতি দ্রুত 'উন্নত' জাতির পর্যায়ে উঠতে পারে।

স্পষ্টই বোঝা যায় এই চার দফা ব্যবস্থার লক্ষ্য একই—সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র জাতির সংরক্ষণ ও উদ্বোধন। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কি তবে এ আশঙ্কা করেন নি যে কোনো জাতির আত্মপ্রত্যয় বাড়তে বাড়তে আবার সেই পুরানো ভূয়ো 'জাত্যাভিমান' হয়ে দাঁড়াতে পারে? তারা কি এ ভয় পাননি যে ডজন ডজন স্বতন্ত্র জাতিদের মধ্যে গোলমাল বাধতে পারে আর সে গণ্ডগোল বেড়ে উঠলে জাতির ঘৃণার আগুন আবার জ্বলতে পারে?

না সে আশঙ্কা ছিল না। কেন? কারণ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মনুষ্য জাতি

সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে জাতিবিদ্বেষ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক—অতীতে জনগণের শত্রুরা জেনে শুনে এই বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রাখত কিন্তু সে শত্রুরা নিঃশেষ হলে আগের গণ্ডগোল বা বিদ্বেষের পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কা নেই। নববিজ্ঞানের ভিত্তির পরে প্রতিষ্ঠিত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সরকার কবি শেভচেঙ্কোর 'নূতন ও স্বাধীন পরিবার', বহু জাতির পরিবারের স্বপ্ন ব্যাপকভাবে বাস্তবে পরিণত করতে পারলেন।

কখনো কখনো কথার চেয়ে সংখ্যা অনেক বেশী অর্থব্যঞ্জক। সোভিয়েটের ৭৪টি ভাষায় বই প্রকাশিত হয়—খবরের কাগজ ৭১টি আর পত্রিকা ৬১টি ভাষায়। বিপ্লবের পর ৪০টিরো বেশী জাতি এই প্রথম সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের তৈরী লিখিত ভাষা পেয়েছে। শেক্‌স্‌পিয়রের নাটক ১৭টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। শেভচেঙ্কোর কবিতা ইনগাস, মলডাভিয়ান, তাজিক প্রভৃতি অদ্ভুত ভাষায় ছাপানো হয়েছে।

আর একটি জরুরী কথা। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র জাতির রয়েছে নিজস্ব প্রাণোচ্ছল জীবন। তবু তাদের মৈত্রীবন্ধনও অচ্ছেদ্য।

সোভিয়েটের নানা জাতির মধ্যে ঐক্য বন্ধনের মূলে হল তাদের নূতন জীবনের প্রতি ভালোবাসা, শুধু তাদের আপন আপন জাতি নয় সমস্ত ইউনিয়নকে রক্ষা ও উন্নত করার জন্য তাদের প্রচণ্ড সংকল্প। নূতন সোভিয়েট জীবনধারা প্রত্যেক জাতিকে দিয়েছে মুক্তি, পুনরুদ্ধার করেছে জাতীয় সংস্কৃতি ও গৌরব আর সেই সঙ্গে মুছে ফেলেছে সমস্ত সনাতন শোষণ ব্যবস্থা।

এবার হয়ত আপনারা বুঝছেন ইউক্রেনিয়ান সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জরুরী যুদ্ধসংশ্লিষ্ট সম্মেলনের মধ্যেও কেন একটি পুরো অধিবেশন

শেভচেঙ্কোর সম্মানে উদ্‌যাপন করেন। এই কবি পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন জাতীয়তা ও জাতিদম্ভের মধ্যেকার পার্থক্য।

'জাতিদম্ভ' হল এক জঘন্য মতবাদ। জাতিবিদ্বেষ রোগের জীবাণু হল এই। ফ্যাশিস্ট দস্যুরা এই রোগই ছড়ায় দিকে দিকে। এর বিনাশ ঘটাতেই হবে।

'জাতীয়তা' হল গৌরবের জিনিস। প্রত্যেক মানুষ তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই দুর্লভ মর্যাদার অধিকারী হয়। একে রক্ষা করতেই হবে।

কবি শেভচেঙ্কোর দৃষ্টিতে এ সত্য ধরা পড়েছিল যে মনুষ্য জাতি তার জাতি বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক 'বিপুল পরিবারের' মত শান্তিতে থাকতে পারে। একশ বছর পরে সোভিয়েট বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনেতারা প্রমাণ করলেন তাঁর মতের যাথার্থ।

সোভিয়েটের নানা জাতির মানুষের আজ একটি প্রিয় গান হচ্ছে :—

"বিপুল মস্কো থেকে সুদূর সীমান্ত,
আর্কটিক-সমুদ্র থেকে সমরখন্দ
এই দেশে—তাদের এই বিশাল পিতৃভূমিতে
মানুষেরা সর্বত্র বুক ফুলিয়ে বেড়ায়।"

সত্যই শেভচেঙ্কোকে তারা স্মরণ করে শুধু 'মৃদু মধুর ভাষায়' নয়—গৌরব গাথায়ও। নাৎসী বর্বরেরা শেভচেঙ্কোর স্মৃতিমন্দির নষ্ট করলে কিছু যায় আসে না। কবির সত্য অবিনশ্বর। সমস্ত জাতির তরফ থেকে ইউক্রেনিয়ান বিজ্ঞানীরা দেশ থেকে ফ্যাশিস্ট বিতাড়ন ও তার পরে নীপার নদীর পারে সুন্দর শেভচেঙ্কো স্মৃতিমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যাতে সে মন্দির সমস্ত মানব সমাজের পবিত্র স্থান হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কবির "নূতন ও স্বাধীন পরিবারের" স্বপ্ন যে কত সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে পরিণত হয়েছে ইউক্রেনিয়ান বৈমানিক আনানি আন্দ্রিয়েভের উদাহরণ থেকেই তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়। এঁর কথা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আন্দ্রিয়েভ্ তাঁর ভাইকে লেখেন যে তিনি হিটলারী দস্যুদের তাঁর বাপ, মা, ভাই, বোনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে দেখেছেন। চিঠিটি ছিল এতই মর্মস্পর্শী যে তাঁর ভাই রেডিওতে পাঠের জন্য এটি দিয়ে দেন। লক্ষ লক্ষ লোক এ চিঠি শোনে ঠিক যেমন আমাদের দেশেও লক্ষ লক্ষ লোক বেতারে যুদ্ধসংশ্লিষ্ট চিঠি শোনে।

কিন্তু আন্দ্রিয়েভের চিঠি পড়ার পর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। কোনো আবেদন না করা হলেও শত শত লোক ঐ তরুণকে চিঠি লিখে তাঁর পিতার স্থান নেবার আগ্রহ প্রকাশ করে। শত শত নারী চায় তার মায়ের স্থান নিতে। শত শত মেয়েরা তাঁর বোন ও শত শত ছেলেরা তাঁর ভাই হবার দাবী জানিয়ে তাঁকে চিঠি লেখে। সবাই যুদ্ধের পর আন্দ্রিয়েভ্‌কে তাদের পরিবারভুক্ত করার আগ্রহ জানায়। কেউ জানত না যে আর কেউ এমনি চিঠি লিখছে বা এমন কথা ভাবছে।

এই চিঠিগুলির মধ্যে এত ভালোবাসা ও শক্তি পুঞ্জীভূত হয় যে আনানি আন্দ্রিয়েভ্ এগুলি জাতীয় ঐতিহাসিক মিউজিয়ামে দিয়ে দেন। সেখানে এগুলি সবাই পড়তে পারে।

তরুণ আনানি আন্দ্রিয়েভ্ হাজারখানেক চিঠি পেলেন তাঁর পরিবার— তাঁর "নূতন ও স্বাধীন পরিবারের" কাছ থেকে।

সোভিয়েট নারী ও বিবাহ সমস্যা

সভ্যতার উন্মেষ থেকে নীতিগত সমস্যার সমাধান হয় নি। চূড়ান্ত দুর্নীতি থেকে নানা জাতি কঠোর ইন্দ্রিয়-শাসনের চরমে গিয়ে পৌঁচেছে। আজও এমন ধর্মমত আছে যৌন সম্পর্কের পূজা যার অঙ্গ। আবার এমনও আছে যার দৃষ্টিতে যৌন সম্পর্ক হচ্ছে শয়তানের রঙ্গভূমি। 'জাতিগত প্রশ্নের' মতই এ সমস্যাটিও ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'জাতি সমস্যার' মত 'যৌন সমস্যাও' 'মনুষ্য প্রকৃতির' সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয়। সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার কিছু দিনের মধ্যেই যে বিজ্ঞানীরা যৌন, নীতিগত ও পাপ সম্পর্কিত 'সমস্যাগুলির' সমাধানের চেষ্টা আরম্ভ করেন এতে অবাক হবার কিছু নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী, মাদাম লিট্‌ভিনভ্ এর পরে যে পরিবর্তন ঘটেছে অল্পের মধ্যে এত নিপুণভাবে তা দেখিয়েছেন যে আমি এখানে তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করব। ওয়াশিংটনে পৌঁছবার অল্পদিন পরেই মাদাম লিট্‌ভিনভ্‌কে নারীদের জাতীয় গণতান্ত্রিক ক্লাবে বক্তৃতার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই ক্লাবের খানাপিনা হচ্ছে ভীষণ কেতাদুরস্ত ব্যাপার। নামকরা মহিলারা এতে যোগ দেন। মাদাম লিট্‌ভিনভ্ এখানে যেন একটি বোমা ফেললেন।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে প্রকাশ যে তিনি বলেন—"আমি

লক্ষ্য করছি যে এই সভায় মহিলাদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে শ্রীযুক্ত অমুকের "মনোহারিণী পত্নী" হিসাবে। এর থেকে আমিও বাদ পড়ি নি। রাশিয়ায় কিন্তু এমনটা হয় না। সেখানে ঐ মনোহারিণীর পাত্তা পাওয়া যায় না। আমি একজন রাজ-পুরুষের স্ত্রী বলে সেখানে কেউ আমার বক্তৃতা শুনতে আসবে না। সোভিয়েট নারী স্বতন্ত্র ব্যাক্তিত্বের অধিকারিণী। তার প্রতিষ্ঠা তার আপন কীর্তির পরে। স্বামীর ব্যক্তিত্বের ছায়ামাত্র সে নয়।"

সমকক্ষ বলে বড়াই করে যে মার্কিন নারারা তারা মাদাম লিট্‌ভিনভের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-প্রসূত তুলনায় কি ভাবে কশাহত হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। আমাদের দেশের "নারী স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের সাম্য" তিনি পরখ করে দেখলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সেটা যে কত মেকী তা প্রমাণ হয়ে গেল। কারণ যতই আমরা নারী পুরুষের সাম্য নিয়ে গলাবাজী করি না কেন আমাদের সাম্য হচ্ছে লোক-দেখানো। সমস্ত যৌন সমস্যার মূলে আছে অসাম্য।

এই সমস্যার ফল কি হয় সে কথা বহুদিন আগেই রুশ গণতন্ত্রবাদী চারনিয়েশেভস্কি (এই রচনায় অন্যত্রও তাঁর উল্লেখ আছে) বুঝেছিলেন। তিনি লেখেন—"প্রকৃতি নারীকে কী সত্য, দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ মননশীলতার অধিকারিণী করেছে! অথচ এই মন সমাজের কোনো কাজে লাগে না। সমাজ এ মনকে তুচ্ছ করে, ধ্বংস করে, নিঃশেষ করে ফেলে যদিও একে উপেক্ষা বা নষ্ট না করে যদি কাজে লাগানো যেত তবে মানুষ দশগুণ দ্রুতবেগে উন্নতির পথে এগোতে পারত।"

সনাতন রুশ দেশে নারী সমস্যার কথা আর এক রকমে প্রকাশ পেত—"মেয়েদের দৌড় হল উনুন থেকে বাড়ীর দরজা অবধি।"

বিপ্লব এ সব নির্মূল করল। সোভিয়েট নব-বিজ্ঞানের দরবারে যৌন

সমস্যার কথা উপস্থিত করল। সবাই প্রশ্ন করল "মনের দিক থেকে নারী পুরুষের নিকৃষ্ট এ কথা কি ঠিক?" উত্তর হল "না।" "নারী কি শারীরিক দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট?" আবার উত্তর পাওয়া গেল "না"। "তবে সামাজিক দিক দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে কি কোনো ভেদ নেই?" এবার বিজ্ঞানীরা বললেন "হ্যাঁ আছে।"

কার্যক্ষেত্রে, সামাজিক দিকে বা দৈনন্দিন জীবনে নারী পুরুষের যে পার্থক্য আছে তার মধ্যে কোনো রহস্য নেই। এই প্রশ্ন সম্পর্কে যত সব আজগুবী জিনিস লেখা হয়েছে সে সব উপেক্ষা করে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা নারী-সমস্যার মূলে আঘাত করলেন।

"পুরুষ সন্তানকে গর্ভধারণ করে না—করে নারী। গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব নারীকে পুরুষের সত্যকার সমকক্ষ হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। এ রকম হবার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই। আধুনিক সমাজে নারীর সত্যকার স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব।"

নারীর সত্যকার স্বাধীনতা অর্জন বলতে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা কি বোঝাতে চান? এই যে প্রত্যেক নারী মাতৃত্বের দুর্লভ অধিকার, স্বামী ও সন্তান লাভের অধিকার ভোগ করার স্বাধীনতা পাবে—সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করার তার মহামূল্য অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে।

সোভিয়েট রাশিয়ার নারীদের—বাড়ীতে থেকে সংসার পাতা বা "বৃত্তিজীবী নারী" হয়ে সন্তান প্রসবের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা এই দুইএর মধ্যে বাছাই করে নিতে বলা হয়নি। সোভিয়েট নারীদের বলা হল যে জীবিকা অর্জনের সুযোগ না হারিয়েই তাদের পক্ষে বিবাহ, সন্তান পালন ও সংসার করা সম্ভব।

'জন্ম নিয়ন্ত্রণের' দ্বারা সোভিয়েট নারী স্বাধীন হয়নি। নূতন সমাজ-

তান্ত্রিক সমাজ গড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়ে মাতৃত্বের চরম গৌরবান্বিত অধিকার অর্জনই সোভিয়েট নারীকে মুক্ত করেছে। এইভাবে এ ব্যাপার সম্ভব হল :—

(১) বিবাহিত বা অবিবাহিত প্রত্যেক নারীরই জীবিকানির্বাহের উপযোগী কাজ পাবার অধিকার সাব্যস্ত হল।

(২) প্রত্যেক নারীকেই সন্তান প্রসবের সময় চিকিৎসা ও হাসপাতালের সেবা বিনা খরচে দেওয়া হল।

(৩) সন্তান প্রসবের আগে ও পরে কাজের অনুপস্থিতির সময় সব নারীকেই পুরা বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হল।

(৪) সব বয়সের মেয়েদেরই বিশেষ করে তরুণীদের মুক্তির-মন্ত্র হিসাবে এই সত্য জানানো হল যে দেশ ও পরিবারের কল্যাণ—এ দুয়েরই কাজ সম্মানজনক।

সোভিয়েট যখন 'নারীমুক্তির' এই নীতি ঘোষণা করে তখন সারা দুনিয়ায় যে বিদ্বেষের প্রচণ্ড ঢেউ ওঠে তার কথা আপনাদের মনে আছে কি? এর কারণ বার করা শক্ত নয়। সেই একই কুচক্রী দল যারা জাতিবিদ্বেষ কায়েম রাখতে চেয়েছিল তারাই আবার চাইল নারী অক্ষমতাও বজায় রাখতে। ফ্যাসিজমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানবতার স্বাধীনতা হরণ। এর পক্ষে মস্ত বড় কাজ হল মেয়েদের স্বাধীনতা একেবারে বিনষ্ট করা। জার্মানী ও ইটালীতে নারী ও তরুণীদের অবস্থা জঘন্য রকম নীচে নামানো হয়েছিল। বলা হল 'কামানের খোরাক যোগাবার' কাজই তাদের একমাত্র কর্তব্য। তরুণ-তরুণীদের নীতিবোধ বেশ সুষ্ঠুভাবে চুরমার করা হল। সর্বত্র নাৎসী ও ফ্যাশিস্ট কর্তৃপক্ষ বিবাহের মর্যাদা ও সম্মানকে উপহাস করল। জারজ সন্তান বলে কোনো জিনিসই রইল না কারণ রাষ্ট্রই

পিতার স্থান নিল। জার্মানী ও ইটালীর রাষ্ট্র পারিবারিক ভালোবাসা ও যত্নের তোয়াক্কা না করে অসংখ্য ছেলেমেয়েকে 'মানুষ' করতে লাগল। নারী ও মায়েরা হারালেন স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটুকুও। আর এইভাবে দস্যুরা পরিবার নষ্ট করল, যুবক ও পুরুষদের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি ধ্বংস করল এবং এক পুরুষ জোড়া এমন সৈন্যদল গড়ে তুলল যাদের ব্যবহার হল পশুদের সামিল।

এবার ঘরের কাছে আসা যাক। সোভিয়েটের বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। রাশিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য শুধু রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে বিবাহ নাকচ করলেই হল। খরচ যৎসামান্য। এর ফলে যে কোনো পুরুষ বা নারী তাঁর স্ত্রী বা স্বামীকে ত্যাগ করতে পারেন। কোনো আইনগত বা আদালত খরচ নেই।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রথমত সন্তানদের প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন আছে সোভিয়েট নীতির।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের জন্য কি করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এ কথা বলা দরকার যে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের মনোভাবের পিছনে আছে প্রধানত সন্তানের কল্যাণ কামনা। আমাদের দেশে যে সব মনস্তাত্ত্বিকরা মানসিক ব্যাধি ও উন্মাদরোগ নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা সন্তান ও তরুণদের পরে বিড়ম্বিত বিবাহের সাংঘাতিক বিষময় প্রভাব সম্পর্কে আমাদের বারবার সাবধান করেন। পিতামাতার মধ্যে যখন মিল থাকে না, তাঁদের ভালোবাসা যখন গতায়ু—সন্তানদের তখন অসম্ভব দুর্গতি। আর তাঁরা যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ না করেন (হয়ত বিবাহ-বিচ্ছেদ খরচের দিক দিয়ে বা অন্য কারণে অসম্ভব বলে) তবে ছেলেমেয়েদের বছরের পর

বছর কাটাতে হয় বিদ্বেষ বিষে কলুষিত আবহাওয়ায়। নানা ধরনের মানসিক ব্যাধির তারা হয় শিকার। তারা নিজেদের ও অন্যদের পরেও বিশ্বাস হারায়।

সোভিয়েট বিবাহ-বিচ্ছেদ নীতির লক্ষ্য ছিল সন্তানদের উপর এই কুফল নিবারণ করা। তাই নিয়ম হল বিবাহিত দম্পতি যদি একত্র বসবাস অসহ্য বোধ করে তবে বিবাহ নাকচ করার পথে কোনো বাধাই থাকতে দেওয়া হবে না। পিতামাতার মধ্যে একজন সন্তানের লালনপালনের ভার নেবে। আর বিবাহ বিড়ম্বিত হয়েছে কি না এ প্রশ্নের বিচার উকীল বা বিচারকের হাতে না দিয়ে সোভিয়েট বিবাহ-বিচ্ছেদের কানুন এটা তাদেরই হাতে ছেড়ে দেয় যাদের পক্ষে সম্ভব এর জবাব দেওয়া অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর হাতে। তারা যদি একত্রে বসবাসে অসুখী বোধ করে তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ বিনষ্টির হাত থেকে সন্তানদের জীবন রক্ষা করবে।

সোভিয়েট নীতি ব্যাপারটা কি? সোভিয়েট ইউনিয়নের বিবাহ-বিচ্ছেদ নীতির সমালোচকরা অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এ নীতি সোজাসুজি দুর্নীতি ও পাপের সড়ক খুলে দেবে এবং বিবাহ ও পরিবারের পরে প্রচণ্ড আঘাত আনবে। প্রচার দিয়ে তাঁরা চেয়েছিলেন সত্যকে চাপা দিতে। আসল কথা হল এই, সোভিয়েট বিবাহ-বিচ্ছেদ নীতি—দুর্নীতি ও পাপ দূর করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই রচিত হয়েছিল। দুর্নীতি ও বারাঙ্গনাবৃত্তির কারণ নিয়ে আলোচনা করা সম্পূর্ণ নিস্ফল। ৫০০০ বছর ধরে এই আলোচনা চলছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে বিজ্ঞানীদের কাছে প্রশ্নটা তোলা হল। তাঁরা উত্তরও দিলেন। আলোচনার শেষে এবার কাজ আরম্ভ হল। আজ বিশ বছরের চেষ্টার পর যে ফল পাওয়া গেছে তাই হল এ দিকের সব থেকে ভালো সাক্ষী। আমাদের দেশে যুদ্ধের ফলে বারাঙ্গনাবৃত্তি ও যৌনব্যাধির চিরন্তন

সমস্যা আবার মস্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। দুই বেড়েছে মারাত্মকভাবে কিন্তু এর জন্য আমরা কি করেছি? দুই বীভৎস রোগ—সিফিলিস ও গনোরিয়া সাংঘাতিক রকম বেড়ে চলেছে।

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে আমাদের যে সব সাংবাদিক আছেন তাঁরা আমাদের খবর পাঠিয়েছেন যে ঐ দেশে বেশ্যাবৃত্তি প্রায় নেই বললেই চলে। জারের আমলে রাশিয়ায় অসংখ্য নারী এই 'ব্যবসা' করত। রুশ শহরগুলি দুনিয়ার সব থেকে দুর্নীতিপরায়ণ জায়গার মধ্যে গণ্য হত। আজ সে সবই গেছে বদলে। দুর্নীতি ও পাপের সব থেকে যথাযথ মাপকাঠি যৌনব্যাধি আশ্চর্য রকম কমে গেছে।

বিখ্যাত মার্কিন সামরিক সাংবাদিক কোয়েনটিন রেনল্ডস খবর দিচ্ছেন যে হ্যারিমান কমিশনের সভ্য ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অফিসের ডাক্তার কমাণ্ডার নর্মান বলেছেন যে লাল ফৌজ ও বিমান বিভাগ যৌন ব্যাধি থেকে প্রায় মুক্ত। এ কথা দুনিয়ার আর কোনো সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে বলা চলে না। ডাক্তার হিসাবে এ জিনিস আমায় চমৎকৃত করেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীকে নীতি সম্পর্কে এক নূতন ধারণা দিয়েছে। এই নূতন নীতি একটা সূত্রের পরে প্রতিষ্ঠিত—সেটি হল নারী-পুরুষের সাম্য।

কাজকর্ম সম্পর্কে রুশ নারীর মনোভাবের কথা বিবেচনা করুন। অল্পদিন আগেও অন্যান্য দেশের জনসাধারণ বুঝতে পারত না সোভিয়েট নারীরা কেন রেলগাড়ীর এঞ্জিনীয়র, নাবিক, যন্ত্রবিদ প্রভৃতির কাজ করে। মেয়েদের পক্ষে এ সব কাজ সাংঘাতিক মনে করা হত। কিন্তু এখন যুদ্ধের তাড়ায় যখন দেখা যায় যে আমাদের নারী ও তরুণীরা রাস্তায় কাজের-জামা পরে মোটর চালাচ্ছে বা অন্যান্য

"পুরুষালি" কাজ করছে তখন আমরা প্রতিবাদ জানাই না। অবশ্য মেয়েদের এ সব ভালো লাগলেও তাদের এসব করতে হচ্ছে বলে আমরা প্রায়ই বিব্রত বোধ করি।

রাশিয়ার পুরুষশক্তির মারাত্মক ঘাটতির জন্য মেয়েরা কলকারখানায় ঢোকেনি। যে কাজ সে করতে পারে তা করবার অধিকার আছে প্রত্যেক সোভিয়েট নারীর। কাজ পাওয়া সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত। তার উপরে সোভিয়েট নারীর পক্ষে দেশের কল্যাণের জন্য যে কোনো কাজই সম্মানজনক। তার জন্য কুণ্ঠিত হবার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। স্ত্রী লরীচালক বলে কোনো রুশ স্বামী বিব্রত হয় না। কাজ করতে পারা একটা সম্মান। সোভিয়েট সমাজে একমাত্র কলঙ্ক হচ্ছে আলস্য!

অধিকাংশ অন্য দেশের থেকে একেবারে ভিন্নরকম এই মনোভাব নারী মুক্তির পক্ষে খুবই কার্যকরী হয়েছিল। অফিস, কারখানা বা চাষের ক্ষেত—সব জায়গারই কাজ সম্মানজনক বলে বিবেচিত হল।

সবশেষে সব কাজেই নারীর অগ্রগতির পথে সমস্ত বাধা দূর করা হল। সোভিয়েট নারী হয়েছে জাহাজের ক্যাপ্টেন, কলকারখানা পরিচালক, বৈমানিক ও গভর্নমেন্টের কর্ত্রী। সত্যই তারা পুরুষের সমান হয়েছে বলে সোভিয়েট নারী বিবাহ বা মাতৃত্ব না এড়িয়ে যে কোনো স্থান অধিকার করতে পারে। কেনই বা পারবে না? পুরুষ কি কাজের সাফল্যের জন্য বিবাহ ও পিতৃত্ব ছেড়েছে? পুরুষের কাছে এ প্রশ্ন হাস্যকর। সোভিয়েট নারীর পক্ষেও তাই।

সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নারীর ক্ষেত্রেও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের মত মস্ত তফাৎ আছে। প্রায়ই লোকে আমাদের নারীবাহিনীকে উপহাস করে। রুশ নারীরা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় এই নিশ্চিত

বিশ্বাস নিয়ে যে তারা লাল ফৌজে যে কোনো উচ্চ সম্মানজনক স্থানে উঠতে পারে। এইভাবে বেসামরিক জীবনে একজন নারী চিকিৎসক ভ্যালেন্টিনা গোরিনেভস্কায়া আজ একজন ব্রিগেডিয়ার সার্জন। আসলে তিনি হচ্ছেন লাল ফৌজের চিকিৎসা বিভাগের ইন্সপেক্টর।

নারী বৈমানিক মেজর ভ্যালেন্টিনা গ্রিজোডুবোভা যুদ্ধের সময়ে নাম করেছেন। বোমারু বিমান চালিকা তিনি। তাঁর মত আরো শত শত নারী আছেন। সম্প্রতি একজন মার্কিন সাংবাদিক মেজর গ্রিজোডুবোভাকে সোভিয়েট তরুণীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি জানতে চাইলেন কাজ করার ফলে তারা পুরুষালি মেজাজের বা কোমলতাবিবর্জিত বা 'স্বাধীন জেনানা' হয়ে পড়ে কি না।

মেজর হাসলেন—"আমার একজন শ্রেষ্ঠ তরুণ বৈমানিক এত বেশী মেয়েলি স্বভাবের যে কোনো পুরুষ তার সঙ্গে কথা বললে সে লাল হয়ে ওঠে। প্রায় সব মেয়েই বিবাহিতা। তারা স্বামীদের গৌরব। নারীমুক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নে বিবাহ অনুষ্ঠানকে নূতন মর্যাদা দিয়েছে। মানুষের ভালোবাসায় এর ফলে মুক্তির গৌরব এসেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা এতে ভীষণ রকম কমে গেছে। বেশ্যাবৃত্তি ও সামাজিক ব্যাধিও এর ফলে দূর হয়েছে।

আর নারীমুক্তি রাশিয়ায় আর এক বিপুল পরিবর্তন এনেছে।

ছোটদের স্বাধীনতা

কয়েক বছর আগে আমরা রুশ দেশের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা রকম আজগুবী গল্প শুনতাম। অনেকে বলতেন যে সেখানে বিবাহ উঠে যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তান জন্মাচ্ছে আর পরিবারের জায়গায় আসছে এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—'শিশুজননক্ষেত্র' যেখানে পিতামাতার ভালোবাসা বাদ দিয়ে সন্তান বড় হচ্ছে। আমাদের মস্ত বড় শিশুসদনের ছবি দেখানো হল যেখানে শিশু ও ছোটদের যত্ন নিত সরকারী নার্সেরা।

আসল অবস্থাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। প্রত্যেক শহর ও বড় কৃষিকেন্দ্রে অবশ্যই সরকারী শিশুসদন ছিল। ইংলণ্ডে আজ এমন ধরনের বহু শিশুসদন আছে। উত্তর আমেরিকাতেও সবত্র আমরা এগুলি প্রতিষ্ঠা করছি। কেন? শুধু যে সব মায়েরা কাজ করেন তাঁদের শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য। ছোট শিশুদের যত্ন নেবার হাঙ্গামা থেকে মায়েরা মুক্তি পান। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হল এই যে শিশুসদনে শিশু বিশেষ যত্ন পায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, যথাযথ-ভাবে তাকে খাওয়ান হয়, অসুখ চট্ করে ধরা ও সারানো হয় এবং তাকে জীবন আরম্ভ করার পক্ষে সব থেকে ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই রকম শিশুসদন "পারিবারিক জীবন নষ্ট করে" এই অভিযোগ হাস্যকর। কাজের পর রুশ মেয়েরা তাঁদের বাচ্চাদের আনতে যায় (সাধারণত শিশুসদনগুলি কাজের জায়গাতেই হয়ে থাকে যাতে দুধ খাওয়ানোর জন্য মারা শিশুদের কাছে যেতে পারেন) ও পরে ঘরে নিয়ে যায়। সোভিয়েট সরকার সেই সব দায়িত্বহীন পিতামাতাকে সহ্য করে না

যারা শিশুর জন্ম দেয় অথচ তারপর তাদের একটা 'শিশুসদনে' পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। শিশুদের এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পরিবারের ভিত্তিকে দুর্বল করা নয় দৃঢ় করা।

আসলে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে 'শিশুসদন' চালানোর ব্যবস্থার মধ্যে বিপ্লবী ব্যাপার কিছুই নেই। আমাদের দেশে বড়লোকেরা সব সময়ই তাদের ছেলেমেয়েদের নার্সদের হাতে দিয়ে দেয়! কোনো কোনো উঁচু চটকদার সমাজে বাচ্চারা বাপ-মাদের ভালো করে না চিনেই বড় হয়ে ওঠে। সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন কর্মরত মেয়েদের শিশুর জন্য প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা তত্ত্বাবধানের বন্দোবস্ত করল বহু দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তখন "শিশুজননক্ষেত্র" বলে মহা হৈ চৈ শুরু করলেন।

সন্তান ও পরিবার সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নের মনোভাব জার্মান আক্রমণের ঠিক পরেই একটি ঘটনা থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। রুশ নারীরা মস্কোতে 'শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের' জন্য একটি জরুরী সভা আহ্বান করেন। উদ্দেশ্য ছিল নাৎসী হত্যাকাণ্ডের ফলে যে সব হাজার হাজার শিশুরা অনাথ হয়েছে তাদের যথাযথ যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা ও তড়িৎ আক্রমণের ফলে যে সব বাচ্চারা সাংঘাতিক আহত অথবা মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়েছে তাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখার বন্দোবস্ত করা। একজন নারী প্রতিনিধি বললেন—"ভয়াবহ ঘটনার ঝলসানিতে যে সব শিশুর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে সমস্ত জাতির ভালোবাসা দিয়ে আসুন আমরা তাদের ঘিরে রাখি—আসুন মায়ের স্নেহ দিয়ে তাদের লালন করি।"

এখন সোভিয়েট নারীরা এই "সমস্ত জাতির ভালোবাসা" দ্বারা কি বলতে চান? তাঁরা কি অনাথাশ্রম বা হাসপাতালের মত প্রতিষ্ঠান গড়ে অনাথদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে চাইলেন? না। তাঁরা

এ ধরনের পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা পণ করলেন প্রত্যেকটি শিশুকে কোনো না কোনো পরিবারে নিতে হবে যেখানে দস্যুদের হাতে হত বাপ-মার ভালোবাসার অন্তত কিছুটা তারা পেতে পারবে।

নারীরা আবেদন পাঠালেন। উত্তর এলো হাজার হাজার বাপ-মার কাছ থেকে। এমন কি ছোটরাও চিঠি লিখে এই অনাথ শিশুদের আহ্বান জানালো তাদের ভাই বোন হতে। সব অনাথ শিশুই বেশ ভালো পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবার নিমন্ত্রণ পেল। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষও যে এতে সম্মতি জানালেন তাও খুব স্বাভাবিক। সোভিয়েট ইউনিয়নে "শিশুজননক্ষেত্র" নেই। আছে জার্মানীতে যেখানে রাষ্ট্র জারজ সন্তানের পিতৃত্বের দায় নেয়, যেখানে পশুর মত নরনারীকে উৎসাহ দেওয়া হয় প্রজননকার্যে, যেখানে পরিবারের মর্যাদা উপহসিত ও অসংখ্য শিশু প্রতিপালিত হয় নানা প্রতিষ্ঠানে।

ছোটদের সম্পর্কে সোভিয়েট নীতি বৈজ্ঞানিক পরিচালনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ছোটদের লালনপালনের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়া বৈজ্ঞানিক পন্থা তো নয়ই বরঞ্চ খুবই বেশী অসন্তোষজনক। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে কোনো কিছুই মানুষের ভালোবাসা, সংসার, পরিবার বা বিবাহের স্থান নিতে পারে না।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, কোনো কোনো দিকে রাশিয়ার পারিবারিক জীবন যথেষ্ট বদলে গেছে। এখানেও নববিজ্ঞানই সরকারী নীতি প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে। কে না জানে—স্বেচ্ছাচারী বাপ-মার জবরদস্তি প্রপীড়িত, দারিদ্রের ভয়ে শঙ্কিত, জাতি ও ধর্মগত সংশ্লিষ্ট গোঁড়ামির দ্বারা আচ্ছন্ন ও যথাযথ চিকিৎসার অভাবে দুর্বল হাজার হাজার শিশু অত্যন্ত হতভাগ্য জীবন যাপন করে? সোভিয়েট

কর্তৃপক্ষ সাগ্রহে পারিবারিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করলেও সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের মুক্ত করার জন্য কড়া বন্দোবস্ত করলেন।

চাষী, কারখানার মজুর, নারী, নিপীড়িত জাতি এবং সমস্ত অত্যাচারিত মানুষের সঙ্গে রাশিয়ার ছোটরাও মুক্তি পেল।

এ কাজ চলল স্কুলে। শিশু মনের হদিশ রাখেন যে মনস্তত্ত্ববিদ, যাঁরা শৈশবের ভয়, স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষার খোঁজ রাখেন তাঁরা হাজার হাজার শিক্ষককে বোঝালেন ছোটদের এই নূতন স্বাধীনতার মর্ম। সোভিয়েট শিশুদের বলা হল—"তোমরা হলে সোভিয়েটের ক্ষুদে নাগরিক। তোমরা স্বাধীন। কারো সম্পত্তি নও তোমরা। সোভিয়েট শিশুর কোনো ভয় নেই—তোমাদের সব থেকে আশ্চর্য স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার পূর্ণ অধিকার আছে তোমাদের।"

এ শুধু কথার কথা নয়। এর প্রমাণ যোগাল সর্বব্যাপী অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা—যার প্রসার হল কিণ্ডারগার্টেন থেকে কলেজ অবধি। এর প্রমাণ দিল দেশ জোড়া বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থায় শিশুর সব থেকে মূল্যবান সম্পদ রইল যার হাতে। প্রমাণ মিলল প্রত্যেকের সুযোগ লাভের সমান সুবিধা থেকে—সারা জীবন প্রতিটি মানুষের আপন সম্ভাবনার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছবার প্রতিশ্রুত অধিকার থেকে।

সব থেকে মর্মান্তিক ঘটনা বোধ হয় এই যে সুযোগের অভাবে শক্তি থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা বাধ্য হয় তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা বর্জন করতে। এ শুধু শিশুদের পক্ষেই মর্মান্তিক নয়। সমগ্র সমাজের পক্ষেই এ এক পীড়া-দায়ক ব্যাপার। কত বেঠোফেন তাদের শিশুহৃদয়ে আশ্চর্য সুরের গুঞ্জরন অনুভব করে! তবু তাদের জোটে না শিক্ষক, সংগীত এমন কি একটা পিয়ানোও। নির্বোধ বাপ মা কত আইনস্টাইনকে অঙ্কের

মাথা বেশ পরিষ্কার বলে স্কুল ছাড়িয়ে নেয়—বেশ পাকা খাজাঞ্চি করবার জন্য। আমাদের চিকিৎসা বিদ্যালয়ের জাতি-বিদ্বেষ দুষ্ট কানুনের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান কত হলডেনের সাধনা থেকে বঞ্চিত হয়! কত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নিঃসঙ্গ কৃষিক্ষেত্রের একঘেয়েমি থেকে কখনো মুক্তি পায় না!

রুশ শিশুর পক্ষে তার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করবার পথে কোনো বাধা নেই। কিন্তু শুধু তাই নয়। কর্তৃপক্ষ অবিশ্রাম চেষ্টা করেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে শক্তি অনুসন্ধানের যত রকম উপায় সম্ভব তাই দিয়ে শক্তিমান শিশুকে উৎসাহিত এবং বিপুল দেশের সর্বত্র ঐ রকম শিশুর সামনে সব রকম সুযোগের দ্বার অবারিত করার। এর চেয়েও অনেক দরকারী কথা; সুযোগের পথ প্রত্যেক শিশুর জন্যই উন্মুক্ত; কয়লা খনির মজুর, ইতিহাসের অধ্যাপক, স্টেশন কুলী, বৈমানিক, চাষী, ডাক্তার বা লিফ্‌ট-চালক—এদের ছেলেদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হয় না। কথা শুধু শিশুটিকে নিয়েই।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের শিক্ষাসচিব শিশুদের সম্পর্কে বলেছিলেন—"জ্ঞান প্রয়োজনীয় বটে তবে শুধু তখনই যখন নুনের মত তাকে মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে অল্পমাত্রায় বিলি করা হয়। সমস্ত শিশুকে, এমন কি অধিকাংশ শিশুকে পড়তে শেখালে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশী।"

আর জারের মুখে ছিল তার বিখ্যাত বুলি "বুদ্ধিজীবী—এই শব্দটা আমার কাছে কি ভীষণ বিরক্তিকর!"

তাই পুরানো রাশিয়া ছিল নিরক্ষরের দেশ। জারের সময় প্রকাশিত হত ৮৫০টি খবরের কাগজ। আজ সেখানে হয় ৯,২৫০টি। কাগজের মোট গ্রাহক সংখ্যা হল ৩,৮০,০০,০০০। জারের সময় ১৯১৩ সালে

৮,৭০,০০,০০০, বই ছাপা হত। এখন প্রত্যেক বছর বেরোয় ৬০ কোটি বই।

নূতন রাশিয়ায় শ্রেণীবিভাগ নেই। কিন্তু সবার উপরে, সব থেকে বেশী আরামে আছে একটি শ্রেণী—ছেলেমেয়েরা।

সোভিয়েট শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা জার আমলের বা অন্য দেশের এখনকার অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম। কিছুদিন হল গণতান্ত্রিক দেশগুলির শিক্ষক সম্মেলনে ছোটদের পাঠ্য ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবাদ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অবস্থা অনেকটা এই রকম : সব থেকে বড় লেখক, শিল্পী ও রসপরিবেশকরা ছোটদের জন্য কিছু করতে পারেন না কারণ 'শিশুপাঠ্যের বাজারে' তেমন পয়সা নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে অনেক ছোটদের পত্রিকা গল্প পিছু মাত্র দু-তিন ডলার পারিশ্রমিক দেয়।

আমি নিজেই তো একবার একটা গল্পের জন্য ৬৭ সেন্ট পেয়েছিলাম যদিও ওটা লিখতে আমার লেগেছিল দু দিন! থিয়েটার ও হলিউডের অবস্থাও একই রকম। বিশেষ করে ছোটদের জন্য অভিনয় বা ফিল্ম খুব কমই দেখা যায়। কোনো নামকরা অভিনেতা বা অভিনেত্রী স্বপ্নেও ছোটদের জন্য অভিনয় করার কথা ভাবেন না। আমোদ-প্রমোদ ছাড়া অন্য দিকেও একই অবস্থা। ছোটদের জন্য লেখেন এমন বৃটিশ, মার্কিন বা কানাডিয়ান বৈজ্ঞানিকের নাম করবার চেষ্টা করুন তো। আছেন কি একজনাও?

সোভিয়েট ইউনিয়নে কিন্তু সব থেকে মস্ত শিল্পী, লেখক, কবি, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, সংগীতজ্ঞ ও গায়ক, অভিনেতা ও বৈজ্ঞানিকেরা ছোটদের কাছে অকুণ্ঠভাবে তাঁদের ঐশ্বর্য বিতরণ করেন। এ কাজের জন্য তাঁদের মোটা টাকাও মেলে। কিন্তু পারিশ্রমিকই একমাত্র প্রেরণা

নয়—এমন কি মূল প্রেরণাও নয়। ছোটদের খুসী করতে, তাদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে, বিশ্বের নানা বিচিত্র কথা বুঝিয়ে বলতে, অতীতের বিপুল কীর্তি দেখিয়ে ও মানবজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলে তাদের অনুপ্রাণিত করতে শক্তিমান মাত্রই আত্মশ্লাঘা ও আনন্দ বোধ করেন।

রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবিত সাহিত্যিক সোভিয়েট ছেলেমেয়েদের জন্য বই লিখে সারা দুনিয়ায় নাম কিনেছেন। নিশ্চয়ই আপনারা এম ইলিনের লেখা New Russian Primer, 100 000 Whys প্রভৃতি বইএর ইংরাজী অনুবাদ দেখেছেন। এঞ্জিনীয়র জোলোটভস্কি ডুবুরীদের লোমহর্ষক বৃত্তান্ত নিয়ে লিখেছেন Under Water Mechanics, বৈজ্ঞানিক মেকু্‌লিয়েভা সূক্ষ্ম মাপজোপ সম্পর্কে The Factory of Exactness বলে বই লিখেছেন। এগুলি সবই প্রতিভাবান ব্যক্তিদের লেখা চমৎকার চমৎকার বই শুধু ছোটদের জন্য লেখা। রাশিয়ায় ছোটরা সাগ্রহে এ সব পড়ে আর তাই অল্প বয়সেই সাহিত্য ও শিল্প-কলা ছাড়াও তারা কৃষি, শিল্প, এঞ্জিনীয়ারিং ও সাধারণভাবে বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়।

আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ছেলেমেয়েদের কিছুতেই মন ওঠে না। ১৮৩টি থিয়েটার আছে শুধু তাদেরই জন্য। সারা দেশে শত শত সাধারণ থিয়েটারও সপ্তাহে একদিন ছোটদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে। এখানে ফিল্‌ম দেখানো হয় না, হয় রীতিমত রঙ্গমঞ্চের অভিনয়। সব থেকে বড় অভিনেতা, অভিনেত্রীরা এতে নামেন। অপেরার বিখ্যাত গায়ক গায়িকারা এখানে গান করেন। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও অর্কেষ্ট্রার দল যন্ত্র সংগীতের ব্যবস্থা করেন। আর এই সব শুধু ন-মাসে ছ-মাসে বিশেষ বন্দোবস্ত করে বড়দিনের সময় বা গরমের ছুটিতে হয় না।

কোটি কোটি সোভিয়েট ছেলেমেয়ে প্রতি হপ্তায় তাদের আমোদ প্রমোদ উপভোগ করে।

কোনো শিশুই এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় না। দরজায় টিকিট বিক্রেতার উৎপাত নেই। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য দরজা খোলা।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র যে বিরাট ছোটদের পার্ক ও খেলার জায়গা দেখা যায় সেখানেও এই ব্যবস্থা। ভিতরে যখন সুন্দর সুন্দর খেলনা নিয়ে খেলা জমে ওঠে তখন বেড়ার ওধারে কোনো বিষণ্ণ শিশু খেলার দিকে তাকিয়ে থাকে না। খেলনা আছে সবার জন্যই।

বই, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলা সবই সবার জন্য। কোনো দেশেই শৈশব ফিরে আসে না।

রুশেরা বলে "আগামী দিনে দুনিয়াটা হবে সুন্দর বসবাসের স্থান। শিশুদের নূতন জীবনকে পাওয়া চাই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। তাই আমরা তাদের উপর সব কিছু বর্ষণ করি দু হাতে। সম্পত্তি পাবার জন্য তাদের বাপ-মার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। আমাদের যা কিছু আছে সবই ছেলেমেয়েদের দেবো বলে আমরা ঠিক করেছি। সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নই হবে তাদের। আর এ সব কিছু আমরা তাদের দিচ্ছি এই মুহূর্তেই!

শৈশবের তর সয় না। যৌবন আসে অকস্মাৎ—আনে নূতন সমস্যা, আশা, আকাঙ্ক্ষা। এই যুদ্ধের আগে যে ভীষণ মন্দার যুগ চলছিল সেই সময় আমাদের দেশের তরুণদের বলা হত "ভবিষ্যতহীন উত্তর-পুরুষ"। রাশিয়ায় তরুণ তরুণীদের অবস্থা কেমন ছিল তখন?

দুটি মস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সোভিয়েটের তরুণদের অন্য দেশের থেকে পৃথক করেছে। প্রথমত শিক্ষা শেষ হলেই প্রত্যেক তরুণ তরুণী কাজ ও বেতন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত শিক্ষা বা

কোনো বিশেষ চর্চা প্রত্যেক তরুণই আপন মানসিক শক্তি ও সামর্থ অনুসারে যতদিন খুসী চালাতে পারে। টাকার জন্য তাকে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হয় না।

অবশ্য এ হল শুধু ছোটদের জন্য ঢালা, অবাধ সুযোগ যোগাবার নীতিরই বিস্তৃতি—তারুণ্যের ক্ষেত্রেও। একটা তফাৎ কিন্তু আছে। রাশিয়ায় সব তরুণের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষার স্কুলের দরজা খোলা নেই। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, চিকিৎসার স্কুল, সংগীতসদন প্রভৃতিতে টাকা দিয়ে ঢোকবার যো নেই। প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাই শুধু তরুণদের সেখানে প্রবেশ করার অধিকার দেয়।

তাই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই সব ছাত্রের ভীড় নেই যারা শুধু ফুর্তি করতে চায় বা "উচ্চশ্রেণীর" তরুণদের মধ্যে কলেজ ডিপ্লোমার ফ্যাশান আছে বলে যারা এখানে ঢুকতে চায়। বরঞ্চ দরিদ্র নীচ শ্রেণীতে জন্ম বা জাতির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাউকে ফেরায় না। উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার একটিমাত্র লক্ষ্য আছে—খুঁজে বার করে তাদেরই শিক্ষা দেওয়া যারা নিজেদের ও জাতির কল্যাণে সে জ্ঞান প্রয়োগ করতে সক্ষম।

এরই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত টেনে সোভিয়েট অনেক আগেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলা ও শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন দেবার ব্যবস্থা চালু করে। সমস্ত জাতির চোখে এই তরুণেরা হচ্ছে সমাজের সম্পদ—তারা খাটছে নিজেদের আরো বেশী সমৃদ্ধ করে তুলতে। পোষকতার জন্য তাদের কেন বাপ-মার মুখাপেক্ষী হতে হবে? অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য কেন অপেক্ষা করতে হবে পাঁচ বছর—কখনো বা আট বছর? ছাত্রদের বেতন দেবার ব্যবস্থা আরো সুদূরপ্রসারী। তরুণ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা অক্ষুণ্ণ রেখে বিয়ে করতে দেওয়া হয়। তারা বিদ্যালয়ের দালানেই

সংসার পাততে পারে। যদি তারা পরিবার গড়ে তুলতে চায় তবে সন্তান পিছু তাদের বেতনের হার বৃদ্ধি পায়। আমাদের কাছে অদ্ভুত বোধ হলেও এইটেই যুক্তিসঙ্গত। সব থেকে ভালো ধরনের ছাত্রদের এতে স্কুলে থাকতে উৎসাহ দেওয়া হয়, তারা, শিক্ষার সুবিধা পায় পূর্ণ-মাত্রায়—আবার সেই সঙ্গে ছাত্রদের চিরন্তন নৈতিক সমস্যার সমাধান হয় এতে!

সোভিয়েট ছাত্রদের দু বার লম্বা ছুটি মেলে—গরমের সময় দু মাস, শীতকালে দু হপ্তা। বিশ্রামাগার বা স্যানাটোরিয়ামে ছুটি কাটানো যায়, সেখানে তরুণ তরুণীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে—কিম্বা তারা শুধু বিশ্রাম করতে পারে। এই ছুটি বা চিকিৎসার জন্য কোনো খরচ নেই। ট্রেড ইউনিয়ন থেকেই তা দেওয়া হয়। যারা আরো বেশী সক্রিয়ভাবে ছুটি কাটাতে চায় তাদের জন্য দেশের সর্বত্র দেখবার বা আবিষ্কারের জন্য ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

শুধু তরুণ নয় প্রত্যেক বয়স্কেরই উচ্চশিক্ষার সুযোগ আছে। রাশিয়ায় বয়স্ক শিক্ষার বিপুল পরিকল্পনা এখানে আলোচনা করার মত স্থান আমাদের নেই। মধ্যবয়স অতিক্রম করেও লক্ষ লক্ষ লোক নূতন শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে আর এইভাবে সোভিয়েটের সব থেকে নামকরা শিল্প বিশেষজ্ঞ, এঞ্জিনীয়ার, কৃষিবিদ ও শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজনের সন্ধান পাওয়াও গেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে বয়স নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর সামনে বৃত্তিলাভ ও বিশেষ শিক্ষা পাবার সুবিধা ছড়িয়ে দিয়ে 'শিখবার বয়স যায় না' এই পুরানো কথার যথার্থ কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হচ্ছে।

ছোটদের নিয়েই এই অধ্যায় শুরু। আমরা পৌঁচেছি পরিণত বয়সে। চিকিৎসা ও ব্যাপক স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সোভিয়েটে বয়স্ক লোকের সংখ্যা

বহুলাংশে বাড়িয়েছে। হয়ত সোভিয়েটের বৃদ্ধদের আমরা দ্বিতীয় সুবিধাভোগী শ্রেণী বলে নামকরণ করতে পারি। কর্মমুখর জীবন থেকে যারা অবসর নিয়েছেন তাঁদের সব রকম যত্ন ও আরামের ব্যবস্থা আছে। বৃদ্ধ বয়সে দারিদ্রের ভয় সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়েছে সকলের জন্যই পেন্‌সনের ব্যবস্থায়! রোগী ও কর্মশক্তিহীনদের জন্য চমৎকার পরিবেশের মধ্যে বিশ্রামাগার ও স্যানাটোরিয়াম আছে। যারা দেহ মনে এখনও তারুণ্য অনুভব করে তাদের জন্য আছে প্রাণোচ্ছল নূতন দেশের বিচিত্র ও অফুরন্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের অবকাশ।

জীবন ও অবকাশ রয়েছে উপভোগের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু শুধু ছোটদের ও সারা জীবন খেটে যারা অবসর অর্জন করেছে তাদের জন্যই কি স্বর্গ?

ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর রাশিয়া থেকে যত বিস্ময়কর খবর এসেছে তার মধ্যে এই খবরের জুড়ী খুব কমই আছে যে ১৯৪১ সালের বড়দিনে সোভিয়েট ইউনিয়নের গির্জাগুলিতে ভক্তদের ভীড় জমেছিল ভীষণ রকম। আমাদের মধ্যে যাঁরা ধর্মপ্রাণ ও যাঁরা নিয়মিত গির্জায় যান বিশেষ করে তাঁদের বিস্ময়টাই ছিল বেশী। কারণ আমাদের কি বলা হয়নি যে সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে এক ধর্মহীন দেশ, সেখানে সমস্ত গির্জার দরজা জোর করে বন্ধ হয়েছে আর বিপ্লবের সময় সেখানকার গির্জার মাথাদের হত্যা করা হয়েছে ?

একটা বছর কেটে গেল। কেউ কেউ বলল যে সোভিয়েট সরকার রাশিয়ায় ধর্মের স্বাধীনতা আছে—দুনিয়াকে এই ধাপ্পা দেবার জন্য ইচ্ছা করে গোটাকতক গির্জা খুলেছে। কিন্তু ১৯৪৩-এ জানুয়ারীর গোড়ার দিকে আর একটা মস্ত বিস্ময় এদের হকচকিয়ে দিল। ৫ই জানুয়ারী রুশ Orthodox Catholic Church-এর অস্থায়ী প্রধান পুরোহিত মেট্রোপলিটন সার্জিই লাল ফৌজের একটি নূতন ট্যাঙ্ক ডিভিশন গড়ার জন্য এক তহবিল খুললেন। নিজে তিনি দিলেন এক লক্ষ রুবল। এই নূতন ডিভিশনের নামকরণ হল ধর্মপ্রাণ, সাধু ডনস্কয়ের নামে। প্রধান পুরোহিতের ঘোষণার উত্তরে স্বয়ং স্টালিন পাঠালেন ব্যক্তিগত অভিনন্দন ও ধন্যবাদ "ধর্মযাজক ও ভক্তদের।"

এই খবরে অধিকাংশ মানুষই অবাক হল। সাধারণভাবে এই কথাই সবাই বিশ্বাস করত যে সোভিয়েট সরকার ধর্মবিশ্বাস সমূলে নষ্ট করেছে

বা গ্লানিময় দারিদ্রের মধ্যে ধর্মকে নির্বাসিত করেছে আর অন্যদিকে চালিয়েছে ধর্মবিরোধী প্রচার। এই নিন্দাবাদ খ্রীষ্টানদের উপযুক্ত নয়। সোভিয়েট সরকার শুধু গির্জাকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন আর সব গির্জাকে আত্মনির্ভরশীল হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে নাস্তিকতার প্রচার হয়েছে কিন্তু আমরা যত ব্যাপকভাবে ভেবেছি ততটা নয়। অনেক বছর আগেই ধর্মবিরোধী রচনা প্রকাশ বন্ধ হয়েছে।

রাশিয়ার ধর্মের উপর কি অত্যাচার চলে? ঠিক কথাটি কি!

আসল কথাটা খুব সোজা। দেশে ধর্মমতের স্বাধীনতা আছে কি নেই এ সম্পর্কে সোভিয়েটের মানুষই হল সব থেকে ভালো বিচারক। রাশিয়ায় ধর্মবিশ্বাসীদের চোখে হিটলারী বর্বরদের অন্যান্য দেশের মত এখানেও আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ চিহ্নটুকুও ধ্বংস করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লাল ফৌজ, সোভিয়েট সরকার, স্টালিন নিজে হলেন ধর্মবিশ্বাসের রক্ষক। কিয়েভ ও গালিকের প্রধান ধর্মযাজক নিকোলাইকে সোভিয়েট সরকার নাৎসী অত্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য 'বিশেষ রাষ্ট্রীয় সমিতির' সভ্য নিযুক্ত করেছেন। এই শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলেন—"রুশ ধর্মযাজকদের প্রতি ফ্যাশিস্টরা বিশেষ রকম বিদ্বেষ দেখিয়েছে। কিন্তু রুশ জাতি, তাদের ঐশ্বর্য বা মন্দিরের বিরুদ্ধে জার্মানদের একটি অত্যাচারও যাতে উপেক্ষিত না হয় তা আমরা দেখব।" আমার কাছে পাঠানো এক লম্বা বিবরণীতে মেট্রোপলিটন নিকোলাই ধর্মযাজক ধর্মযাজিকাদের পরে নাৎসী অত্যাচারের যে তালিকা দিয়েছেন বীভৎসতার জন্য ছাপার অক্ষরে তা অপ্রকাশ্য। জার্মান অফিসার ও সৈন্যরা কি ভাবে গির্জায় ঢুকে "বিশ্বাসীদের সামনেই উচ্ছৃঙ্খল কথাবার্তা বলে, পবিত্র বিগ্রহের পরে থুতু ফেলে, ক্রুশের অপমান করে" তার অনেক দৃষ্টান্ত তিনি আমায় দিয়েছিলেন।

মেট্রোপলিটন নিকোলাই সোভিয়েট সরকারের তরফ থেকে এই সব অত্যাচার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন। সরকারও অত্যাচারের জন্য যখন নাৎসী পশুদের বিচার হবে তখন এসবের পূর্ণ প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া আর কোন্ রাষ্ট্র স্বাধীনতা ও ধর্মসংশ্লিষ্ট পবিত্র ধনসম্পদ রক্ষার জন্য সরকারীভাবে এই রকম চেষ্টা করেন ?

এ ছাড়া আরো অনেক তথ্য থেকে প্রমাণ হয় যে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে শুধু ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করে তা নয়—বিশ্বাসীদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লড়াইও করে। নাৎসীরা এ কথা ভালো করেই জানে। লেনিনগ্রাদের মেট্রোপলিটন অ্যালেক্সাই বলেন—"হিটলারের দস্যুদল সুন্দর রুশ গির্জা ধ্বংস করে আনন্দ পায়।" এই সব গির্জা কম্যুনিস্টরা ধ্বংস বা অধিকার করেনি। বরঞ্চ রাষ্ট্রের খরচে এর অনেকগুলিকেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করা হয়েছে। হিটলারী বর্বরেরা যে সব আশ্চর্য চমৎকার সৌধ ইচ্ছা করে নির্মমভাবে ধ্বংস করেছে তার মধ্যে আছে মোজাইস্কের স্বর্গারোহনের গির্জা, পোক্রভস্কের ক্যাথিড্রাল, ক্যাথেরিনের গির্জা, কালিনিনের শহীদ মন্দির এবং ১০৬৫ সালে, নর্মানরা ইংলণ্ড জয় করার আগে প্রতিষ্ঠিত চার্নিগভের রূপান্তরের অমূল্য ক্যাথিড্রাল। পুরো তালিকা দিতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে যাবে।

লাল ফৌজের জন্য প্রার্থনা করার সময় মেট্রোপলিটন অ্যালেক্সাই বললেন, "সত্যের জন্য যাঁরা অস্ত্র ধারণ করেন ও যাঁরা দেশের জন্য দুঃখ যন্ত্রণা বা শহীদদের মৃত্যু বরণ করেন স্বর্গরাজ্য তাঁদের জন্যই।"

এসব তথ্যের মধ্যে আশ্চর্য ব্যাপার হল এই—রাশিয়ার মানুষ গির্জার লোকেরা যে লাল ফৌজের জন্য টাকা দেয় এতে বিস্ময় বোধ করে না। কিম্বা এতেও অবাক হয় না যে স্টালিন (যাঁকে আমাদের

বহু পাদ্রী খ্রীষ্ট-বিরোধী আখ্যা দিয়েছেন) গির্জা ও বিশ্বাসীদের কাছে ব্যক্তিগত অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাশিয়ায় এসব ব্যাপারে লোকে আশ্চর্য হয় না। অবাক হয় অন্য দেশের বা আমাদের দেশের লোক—যাদের সোভিয়েট ইউনিয়নে ধর্মমতের স্বাধীনতা সম্পর্কে নানারকম আজগুবী মিথ্যা কথা শোনানো হয়েছে।

এই চিঠিটা ভালো করে পড়ে দেখুন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ায় মস্কোর 'এসাম্পশান' গির্জার ধর্মযাজক ভলাডিমির স্টেফানভ এটি লেখেন স্টালিনকে "সামরিকভাবে অধিকৃত অঞ্চলে আমাদের যে সব ভাইবোন ফ্যাসিজমের কবলে পড়ে ফ্যাসিস্টদের হাতে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন ভোগ করছেন আত্মার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য আমি গভীর দুঃখ অনুভব করছি। যত শীঘ্র সম্ভব লাল ফৌজ যাতে শত্রুকে পরাস্ত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে আমার গির্জার সমস্ত মজুত টাকা—নগদ টাকায় মোট ২,৭৩,০০০ রুবল জমা করেছি। যোশেফ ভিশারিয়োনোভিচ, আমি তোমায় অনুরোধ জানাচ্ছি এই টাকা দিয়ে বীর পূর্বপুরুষ নেভ্স্কি ও ডনস্কয়ের নামে দুটি যুদ্ধবিমান বানাতে। সমস্ত মানবতার পরে হিটলারী বর্বরেরা যে দুর্গতি টেনে এনেছে এই শক্তিশালী বিমানগুলি তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করুক।"

এ থেকে মনে হয় না কি যে সোভিয়েটে গির্জা শুধু যে স্বাধীন ও রাষ্ট্রের পরিপোষক তাই নয়—তার হাতে বেশ দু পয়সা আছে। গণতন্ত্রগুলিতে কটা গির্জা মস্কোর 'এসাম্পশান' গির্জার মত একটি কেন্দ্র থেকে যুদ্ধের জন্য অত টাকা দান করেছে? মানবতাকে হিটলারী বর্বরতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কটা গির্জা তাদের সমস্ত মজুত টাকা দিয়েছে?

এই সংক্ষিপ্ত তথ্যগুলি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে জাতিকে 'নাস্তিক' বলে নিন্দাবাদ করা হয়েছিল সেই আজ ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা ও ন্যায়ধর্মের স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে।

আশ্চর্য নয়া দুনিয়া

এই বই পড়ে আপনি সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে সারা দুনিয়াতে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত তাজ্জব দেশ আর নেই। সোভিয়েট জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি দিক আমাদের কাছে অপরিচিত, এমন কি বিস্ময়কর।

যেমন ধরুন, সোভিয়েট চাষী অবিশ্রাম চেষ্টা করছে তার জমির ফসলের হার ও গরুর দুধের পরিমাণ বাড়াতে। বাজার দর বা দাম ও দুধের বাড়তি আছে কি নেই এ নিয়ে সে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। তার চিন্তা হচ্ছে চাষের উৎপাদন বাড়ানো যাতে ক্রমেই বেশী খাদ্য পাওয়া সম্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে কৃষির উৎপাদন পটুতাও বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করে। এর ফলে কিন্তু চাষীরা জমি থেকে বিতাড়িত হয় না—ফল হয় চাষী ও তার পরিবারের মেহনতের সময় কমে।

আমাদের কাছে এ সবই খুব তাজ্জব বোধ হয়। কারণ আমরা অভ্যস্ত গমের ক্ষেতের দারুণ সংকোচনে, বাড়তি ফসল সম্পর্কিত জটিল সমস্যায়, জমিতে ক্রমাগত বেশী যন্ত্র লাগানো সত্ত্বেও অবিশ্রান্ত চাষের খাটুনিতে।

কিন্তু সত্যই কি ব্যাপারটা অতই তাজ্জব ?

এ কথা কি বোঝা এতই কঠিন যে চাষের ক্ষেতের আয়তন এমনভাবে স্ফীত হয়ে ওঠা উচিত যাতে দেশের প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য জোটে ? এতে অদ্ভুত কি আছে যে কৃষির উৎপাদন

দক্ষতা থেকে যে সুবিধা পাওয়া যায় তা সচ্ছল জীবন ও পরিশ্রমের সময় হ্রাসের মধ্যে দিয়ে চাষীদেরই ভাগ্যে জোটা উচিত ?

এ কথা ভুলবেন না যে আমাদের দেশে কোনো কোনো লোক সারা জীবন যথেষ্ট খেতে পায় বা কোনো কোনো চাষীর জীবনযাত্রা দামী যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে সহজ হয়ে ওঠে—এতে আমরা অদ্ভুত বা অন্যায় কিছু দেখি না। ভালো কথা !

এবার তবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ কথা যে সোভিয়েট কৃষির সত্যকার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হল শুধু এই—সেখানে কোটি কোটি মানুষকে ওরা যথেষ্ট খেতে দিচ্ছে, সমস্ত চাষীর জীবনই সহজ করে তুলেছে।

সোভিয়েট কয়লাখনির মজুরেরা যখন শুনল যে, যে খনিতে তারা এতদিন জীবিকা অর্জন করত তা বন্ধ করে দেওয়া হবে তখন তারা সত্যসত্যই সেই এঞ্জিনীয়ারদের চীৎকার করে অভিনন্দন জানালো যাঁরা কয়লা জ্বালাবার নূতন কল বসাতে এসেছিলেন। জমির নীচে তাদের কাজ চিরদিনের মত খতম হয়েছে শুনে তারা ভীষণ খুসী হয়ে উঠল।

আমাদের কাছে এ শুধু আশ্চর্য নয়—পাগলামি বোধ হয়। ভাবুনতো হাজার হাজার খনি মজুর কাজ যাচ্ছে বলে আনন্দে লাফাচ্ছে !

সোভিয়েট খনিমজুরেরা কি তবে পাগল ? তারা জানত যে কয়লা জ্বালানী যন্ত্রকে ঘিরে যে বিরাট রাসায়নিক কারখানা গড়ে উঠবে তাতে কাজ থাকবে ওদের জন্য। সেই নূতন কাজ হবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর দালানে। খনি-জ্বালানোর প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে কয়লা খনির মজুরদের কঠিন, নোংরা ও বিপদজনক মেহনতের দিন ফুরলো।

অবশ্য কেউ কেউ যদি আমাদের দেশে খনির কাজ ছেড়ে অন্যত্র অপেক্ষাকৃত কম বিপদজনক ও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বেশী অনুকূল কাজ পায় তাতে আমরা পাগলামির কিছু দেখি না। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্ত

করতে পারি যে সোভিয়েট খনিমজুরের উল্লাসের মধ্যে তাজ্জব ব্যাপার আসলে হল এই যে লক্ষ লক্ষ লোক এর ফলে খনির অন্ধকূপ ছেড়ে দিনের আলোয় উন্নততর কাজ করতে পেলো।

আমরা দেখেছি শান্তি ও যুদ্ধ—দু সময়েই সোভিয়েট নারীরা কিভাবে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করে। ব্যতিক্রম নেই বললেই হয়। বিবাহ ও সন্তান হবার পরও তারা কাজ ছাড়ে না। কাজকে তারা সম্মান মনে করে।

আমাদের কাছে আশ্চর্য ঠেকে যখন স্বামী প্রতিপালন করার মত যথেষ্ট রোজগার করা সত্ত্বেও বিবাহিতা নারী কাজ চালিয়েই যায়। বর্তমানে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় যে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিতে কাজ করে মেয়েরা দেশ সেবা করার সুযোগ পেয়েছে এতে আমরা আনন্দিত। তবে শান্তির সময়ে সোভিয়েট নারী যখন কাজ করে তাতে অভিনবত্ব কোথায়?

শুধু এইখানে যে সোভিয়েটে শান্তি বা যুদ্ধ যখনই হোক না প্রত্যেকেই যারা কাজ করে তারা সারা জাতিরই সেবা করে। কারণ সমস্ত কলকারখানার মালিক সোভিয়েট সরকার—সমগ্র জনসংখ্যার স্বার্থেই তা চালানো হয়। সোভিয়েট নারী শুধু নিজের বা আপন পরিবারের জন্য কখনো খাটে না—খাটে ১৮ কোটি দেশবাসীর কল্যাণের জন্য।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে বাপ-মার জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও আয় নির্বিশেষে তার সামর্থের অনুপাতে শিক্ষা পায়। প্রত্যেক তরুণই শিক্ষান্তে কাজ পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। কলেজ ছাত্ররা বেতন পায়। এমন কি শিক্ষালাভের সময়েই বিবাহ করতে পারে।

আমাদের কাছে এ সব আজগুবী বোধ হয়—মনে হয় রূপকথার দেশের কাহিনী।

কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের দেশে কোনো কোনো তরুণ টাকার চিন্তা

না করে উচ্চতম শিক্ষা পেতে পারে। এই ভাগ্যবানদের সৌভাগ্যের জন্য কেউ দুঃখিত হয় না। আমরা শুধু চাই যে আমাদের মধ্যেকার সব কটি শক্তিমান তরুণই যাতে অনুরূপ সুযোগ পায়।

তাই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সোভিয়েট শিক্ষানীতির মধ্যে 'উদ্ভট' ব্যাপার হল শুধু এই যে প্রত্যেক তরুণ তরুণীই সেখানে অবাধে আপনার সাধ্যমত শিক্ষা পেতে পারে। কোনো বাধা বা পক্ষপাতিত্বের জন্য তাকে ভাবতে হয় না—আর্থিক সাহায্যের জন্য আত্মীয় স্বজনের দারস্থও হতে হয় না।

আমরা এও দেখছি যে সোভিয়েট ইউনিয়নে কেউ অসুস্থ বা আহত হলে বিনা পয়সায় তার সব থেকে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। সব থেকে অদ্ভুত—সে দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা কিনবার যো নেই।

আমাদের কাছে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকে। কারণ আজন্মকাল আমাদের স্বাস্থ্য, রোগ ও চিকিৎসার কথা ভাবতে হয় টাকা আনা পাই-এর অঙ্কে।

কিন্তু মানুষের প্রতি সোভিয়েট মনোভাব কি সত্যই বেশী যুক্তিসঙ্গত নয়? মানুষের জীবনকে টাকার চেয়ে মূল্যবান গণ্য করা কি বোকামি? কালো মানুষ যে ধলা মানুষের মতই কষ্ট পেতে পারে এ কথা মানা কি অন্যায়? সমস্ত দেশের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখলে কি ব্যবসা মন্দা যাবে?

ভুলবেন না যে আমাদের দেশে কিছু লোক যে টাকাকড়ির কথা না ভেবেই আজীবন সব থেকে ভালো চিকিৎসা পেতে পারে তাতে আমরা আশ্চর্যের কিছু দেখি না। কোনো কোনো বাপ-মা শিশুর জীবন সংশয় হলে যে ডাক্তারকে বলতে পারেন "টাকার কথা ভাববেন না—সন্তানকে বাঁচান" এতেও আমরা অবাক হই না! আমরা শুধু চাই যে সব বাপ-মারই এ সুযোগ মিলুক।

কাজেই আমাদের মানতেই হবে যে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নীতির মধ্যে যা আমাদের অদ্ভুত লাগে সেটি হল এই যে অসুস্থ ও আহতদের চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাই কোটি কোটি লোক সেখানে সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসালাভ করতে পারে। খরচ সকলেরই—কোনো লোককে ডাক্তারের টাকা গুনতে হয় না।

এবার আমরা সোভিয়েট জীবনের এমন একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলব যা এ পর্যন্ত যত কিছু আলোচনা হয়েছে সে সবের চেয়ে বিস্ময়কর।

এই বই-এর সবত্র আমরা একটা কথার পরে বিশেষ জোর দিয়েছি। সোভিয়েট ইউনিয়নে নববিজ্ঞান হল এক প্রচণ্ড হাতিয়ার যার সাহায্যে মানুষ প্রকৃতিকে আপন ইচ্ছার কাছে হার মানায়।

কিন্তু কেন ?

বিজ্ঞান সোভিয়েটের ১৮ কোটি মানুষকে দেখিয়েছে কি ভাবে রোগ ও অনাহার দূর করতে হয়, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে কি ভাবে সর্বব্যাপী সুসভ্য জীবনযাত্রার স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হয়, হাড়ভাঙা মেহনতের বোঝা কেমন করে তুলতে হয় লক্ষ লক্ষ লোকের কাঁধ থেকে, কেমন করে সমগ্র দেশবাসীকে আনন্দময় জীবনের উপযোগী অবসর ও স্বাস্থ্যের অধিকারী করা যায়।

বিজ্ঞানের গোপন হাতিয়ার সোভিয়েট জনসাধারণকে দিচ্ছে এক অভিনব জীবনযাত্রার ইঙ্গিত।

এই নূতন জীবনের আস্বাদ মানুষকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা আমাদের কাছে আশ্চর্য বোধ হয়। তরুণ কসাক মিখায়েল শোলোকভের কথাই ধরা যাক। রুশ বিপ্লবের গোড়ার দিকে এই তরুণ ডন নদীর উপত্যকায় যে জীবনধারা বয়ে চলেছিল তারই কাহিনী লিখতে শুরু করে। তার গল্প সোভিয়েট পত্রিকায় সেই সময়েই প্রকাশিত হয় যখন কোটি কোটি

নরনারীর অক্ষর পরিচয় আরম্ভ হয়েছে। শোলোকভের রচনা সকলের হৃদয় জয় করল। ১৯২৮ সালে তাঁর বয়স তখন মাত্র ২৩ বছর—শোলোকভের প্রথম উপন্যাস "এ্যাণ্ড কয়েট ফ্লোজ দি ডন" প্রকাশিত হয়। আমরা যাকে 'গুরুগম্ভীর' উপন্যাস বলি—শুধু শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সাধারণত যা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন—এই বই ছিল সেই পর্যায়ের। রাশিয়ায় কিন্তু হাজার হাজার লোক ও পরে লক্ষ লক্ষ লোক সাগ্রহে এই বই পড়ল। মজুর, চাষী ও সৈন্যেরা কসাকদের সম্পর্কে আরো লিখবার অনুরোধ জানিয়ে তার কাছে পাঠালো অসংখ্য চিঠি। বেরোলো আর একটা বই। তার প্রশংসা সমালোচনা দুইই হল। লক্ষ লক্ষ লোক এই 'ডন নদীর' উপন্যাস পড়ল ও আলোচনা করল।

সবশুদ্ধ আটটি উপন্যাস বেরোলো। অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হলে সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরের সাহিত্য সমালোচকরাও স্বীকার করলেন যে শোলোকভ আধুনিক যুগের মস্ত বই লিখেছেন।

এর চেয়েও অনেক বড় কাজ তিনি করেছেন। তিনি সাহায্য করেছেন এক নূতন ধরনের পাঠক সৃষ্টির কাজে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যাকে 'খেলো' পত্রিকা ও বই বলে তার বদলে লক্ষ লক্ষ মজুর চাষী এই রীতিমত 'সাহিত্যিক' বইয়ের দিকেই ঝুঁকেছে। অধিকাংশ সোভিয়েটের মানুষ আবিষ্কার করল যে তাদের জীবন, কাজ ও মনোভাব এমন বদলে গেছে যে তারা এখন শোলোকভের চমৎকার উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনা ও সংস্থান ও সৌন্দর্য খুব গভীরভাবেই উপভোগ করতে পারে। আর কোনো দেশে কখনও এমন ব্যাপার ঘটে নি।

এই সময়েই আর এক সোভিয়েট তরুণ সংগীতের ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের কীর্তি অর্জন করেছিলেন। শোলোকভ যখন লেখা শুরু করেন ডিমিত্রি শোস্টাকোভিচও প্রায় তখনই 'ওস্তাদী সংগীত' সৃষ্টি আরম্ভ করেন।

অনেকগুলি 'সিম্‌ফনির' স্রষ্টা তিনি। সংগীত সমালোচক বা সমঝদার শ্রোতাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠির সামনে এগুলি বাজানো হয়নি। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র ঘরভর্তি শ্রোতাদের কাছে 'ডন নদীর' উপন্যাসের পাঠকদের কাছে, রাশিয়ার শ্রমজীবী নরনারী ও শিশুদের সামনে 'অর্কেষ্ট্রায়' এগুলি বাজানো হয়।

এসব মানুষকে যে জোর করে শোস্টাকোভিচের 'সিমফনি' শুনতে বাধ্য করা হয়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। বরঞ্চ তারা গাঁটের কড়ি বার করেছে কনসার্টের টিকিট কিনতে, লাইনে দাঁড়িয়েছে তারই জন্য, শুনেছে সাগ্রহে আর তারপরে হাজার হাজার পত্র লিখেছে নূতন স্রষ্টার সংগীতকে প্রশংসা জানিয়ে, সমালোচনা করে, আরো 'সিম্‌ফনির' দাবী জানিয়ে। আর কোনো দেশে এমনটি কখনো হয়নি।

এই দুটি দৃষ্টান্ত আমি বেছে নিয়েছি এই জন্য যে আমাদের দেশে সংস্কৃতিবান মহলে শোলোকভ ও শোস্টাকোভিচের সৃষ্টি যথেষ্ট সুপরিচিত। তাদের আপন দেশে আরো অনেক সোভিয়েট লেখক ও সংগীতস্রষ্টার যথেষ্ট নামডাক আছে। বিপ্লবের পরই এদের শক্তি বিকশিত হয়েছে! লক্ষ লক্ষ লোক দরদ দিয়ে এদের অগ্রগতির পথ পরিষ্কার করেছে।

নূতন ও সুন্দরতর জীবনধারা আয়ত্ত করার প্রতিটি সুযোগ জনসাধারণ সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। অবাক লাগলেও এ কথা অত্যুক্তি নয় যে বিশ বছরে সোভিয়েটের মানুষ অবর্ণনীয় নিরক্ষরতার রসাতল থেকে উঠে সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে অন্য সব দেশকে ছাপিয়ে গেছে।

কয়েকটি তথ্য দেখুন। বিপ্লবের পর মোট ১০৬টি বিভিন্ন ভাষায় সোভিয়েটে ৭০'০ কোটিরও বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে। টলস্টয়ের বই বিক্রী হয়েছে এক কোটি বিশ লক্ষ; সম্প্রতি ৯০ খণ্ডে একটি নূতন সম্পূর্ণ

সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পুস্কিনের মৃত্যুর শততম বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর কবিতা, গল্প ও রূপকথা ছাপানো হয়েছে ৮০লক্ষ কপি।

প্রতি বছর রাশিয়ায় ৪৫,০০০ নূতন ও মোট আড়াই কোটি বই প্রকাশিত ও অতি দ্রুত বিক্রী হয়। তবুও লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হতে হয় কারণ জনসাধারণের অসম্ভব চাহিদার তাল সামলানোর মত কাগজ মেলে না।

জগদ্বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গর্কী মারা যাবার কয়েক বছর আগে সোভিয়েট থেকে তাঁর কীর্তির কথা স্মরণ করার জন্য একটি উৎসবের আয়োজন হয়। মস্ত বড় এক শহর, অনেক শহরের সড়ক ও স্কোয়ার, একটি বিদ্যায়তন, লাল বিমানবাহিনীর একটি স্কোয়াড্রন, এমন কি কয়েকটি কারখানারো নামকরণ হয় তাঁর নামে। ঐ সময় অবধি সোভিয়েট প্রকাশকেরা ৩,২০,০০,০০০ খণ্ড গর্কীর বই বিক্রী করে।

এই তথ্য ও অঙ্কগুলির তাৎপর্য খুবই গভীর। সোভিয়েট জীবনে যে কি বিপুল পরিবর্তন এসেছে এর মধ্যে আছে তারই প্রতিফলন। কোটি কোটি লোক বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত সংস্কৃতির জন্য আগ্রহশীল। বৈজ্ঞানিক কৃষি যেমন শহরে গ্রাম্য জীবনের ভেদ দূর করতে সচেষ্ট তেমনই সকলের পক্ষে খোলা এই নবজীবনের সড়ক কায়িক ও মানসিক শ্রমনিযুক্তদের মধ্যেকার পার্থক্য চুরমার করে ফেলেছে।

অবশ্য সকলেই যে পড়তে ভালোবাসবে তার কোনো মানে নেই। সোভিয়েট থিয়েটার (যেখানে অভিনয়, নৃত্য, গীতের আসর জমে) ও ফিল্মের জনপ্রিয়তা বইএর চাইতেও বেশী। মস্কো আর্ট থিয়েটারের মত দলের খ্যাতি দুনিয়া-জোড়া। অন্যান্য দেশে যখন রঙ্গমঞ্চের দৈন্য চরমে পৌঁচেছে সোভিয়েটে তখন হাজার হাজার থিয়েটার, পেশাদার অভিনেতা, অভিনেত্রীরা নিয়মিতভাবে নাটক অভিনয় করেন। বিভিন্ন

জাতির মধ্যে সংস্কৃতি অনুরাগ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে আজ ৬০টি বিভিন্ন ভাষায় আড়াই শয়েরও বেশী শুধু জাতীয় থিয়েটারই রয়েছে। উৎকর্ষের দিক থেকেও এদের অভিনয় অনেক সময়ই মস্কো রঙ্গমঞ্চের সমান দরের। তারপর আছে পরীক্ষামূলক থিয়েটার। নৃত্য হয় নূতন ও পুরানো দুই ধারাতেই। গ্র্যাণ্ড অপেরা, কমিক অপেরা ও গীতিনাট্য কোনো কিছুরই অভাব নেই।

চাষীদের জন্যও থিয়েটারের ব্যবস্থা আছে। ১৯৩৪ সালে একদল চাষী নরনারী তাদের জেলার সুন্দরতম অঞ্চলেও ঘুরবার জন্য এক থিয়েটারের দাবী জানায়। তখনই এর ব্যবস্থা হল। এতে এত প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি হল যে ১৯৩৯-এ পৌছতে না পৌছতেই দেখা গেল যে শুধু কৃষি অঞ্চলের জন্যই ১০,০০০ পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে ৩০০টি কৃষি-রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠল।

শহরে যে রকম অকৃপণভাবে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় যে হঠাৎ বিশ্বাস করে ওঠা যায় না। আমাদের দেশে বহু বড় শহরে এক একটা পুরো ঋতু কেটে যায়—শেক্সপিয়রের একটি নাটকও অভিনয় হয় না। সোভিয়েটে কিন্তু একটি ঋতুতেই মহান ইংরাজ নাট্যকারের একখানি নাটকই (ওথেলো) ১৩টি শহরে অভিনীত হয়। প্রায় পঞ্চাশটি থিয়েটার নিয়মিতভাবে শেক্সপিয়র, গর্কী, শিলার, লোপাদা ভেগা প্রভৃতির নাটক অভিনয় করে।

সোভিয়েট ফিল্‌মের খ্যাতি খুবই স্বাভাবিক। এখন আমাদের দেশেও ওগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এক ধরনের সোভিয়েট ফিল্‌ম আমরা দেখি না। এগুলিতে শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিল ঘটানো হয়।

ধ্বনি ও রং-এর সমন্বয়ে পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি তোলা হয় যাতে ঘড়ি-তৈরী থেকে জীবন্ত নরদেহের বিভিন্ন যন্ত্রের প্রক্রিয়ায় এ সব কিছুর বৈজ্ঞানিক রহস্য চমৎকারভাবে দেখানো হয়ে থাকে। সুন্দর শক্তিশালী ছবি দেখে এঞ্জিনীয়ারিংএর ছাত্ররা শেখে কেমন করে এরোপ্লেন বানাতে হয়। চাষীদের শেখানো হয় জীব প্রজননের জটিল তত্ত্ব। অস্ত্র চিকিৎসকদের ঢিমে গতিতে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের ছবি দেখানো হয়। এই সব উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক ফিল্মের বিষয়গুলি কিন্তু সমস্ত সোভিয়েট জনসাধারণের মন পেয়েছে। এ রকম শত শত ফিল্মের প্রচলন রয়েছে বর্তমানে। অন্য কোনো দেশে এমন বিপুল মাত্রায় দৃষ্টি মারফৎ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই।

সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ কোটি কোটি মানুষের—সমগ্র জনসাধারণের জীবনের অঙ্গীভূত হয়েছে। নানা বয়সের অসংখ্য চাষী মজুর ছবি আঁকা, ভাস্কর্য, গান ও রচনা কৌশল আয়ত্তের জন্য শিক্ষা করছে। সমস্ত ইউনিয়নের যৌথ কৃষিকেন্দ্র বা কারখানায় বিশেষজ্ঞরা অনবরত ঘোরেন প্রতিভার সন্ধানে। রেলের ব্রেকম্যান কাল হয়ত সংগীত পরিষদে ঢুকতে পারে। ইউক্রেনের গো-পালিকার কাছে হঠাৎ লেনিনগ্রাদের ডাক আসতে পারে যোগদানের। ব্রেকম্যান সুরস্রষ্টা! গো-পালিকা নটী! আমাদের কাছে এ সব তাজ্জব বোধ হতে পারে কিন্তু সোভিয়েটে নয়। সেখানে শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

তারা বিশ্বাস করে যে যা কিছু সুন্দর শিল্পমূল্যযুক্ত ও প্রেরণাদায়ক সবই সর্বসাধারণের। সংস্কৃতিকে তারা উপরতলার ব্যাপার মনে করে না। তারা আবিষ্কার করেছে যে সব রকম শিল্পের তাৎপর্য যে কোনো মানুষ ধরতে পারে, উপভোগ করতে পারে, শিল্পের ক্ষেত্রে

প্রত্যেক সৃষ্টিই নূতন আনন্দ ও মহান প্রেরণাময় জীবনের দ্বার খুলে ধরতে পারে। মানবতার বীরত্বমণ্ডিত অতীতের প্রচণ্ড সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার যে সাহস ও শক্তির উৎস তাই দিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারে মানবচিত্তকে।

যুদ্ধ সোভিয়েট জীবনের পরে সাংঘাতিক আঘাত হেনেছে। জীবনের একটি দিকে কিন্তু বেশী বদল হয় নি। শত্রুবেষ্টিত নগরেও যে ভাবে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার ধারা অব্যাহত রয়েছে তাই দেখে বিদেশী সাংবাদিক মাত্রই চমৎকৃত হয়েছেন। যুদ্ধের অভূতপূর্ব তাণ্ডবের মধ্যেও রুশ দেশের সংস্কৃতি তৃষ্ণার অক্ষুণ্ণতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কি ধরনের নূতন জীবনকে রক্ষা করার জন্যই তারা লড়েছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে বিখ্যাত অভিনেতার দল মস্কো মেলি থিয়েটার, যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর সাজসরঞ্জাম গুটিয়ে নিয়ে যুদ্ধসীমান্তের দিকে রওনা হয়। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শেক্সপিয়রের মিলনান্ত নাটক "দি টেমিং অফ দি শ্রু" দেখার চাহিদা এত প্রবল ছিল যে অভিনেতারা একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া সাব্যস্ত করেন। তারা এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে, যে কাজে নিযুক্ত গোলন্দাজের পক্ষে অভিনয় দেখার জন্য কামান ছেড়ে আসা সম্ভব ছিল না। মেলি অভিনেতারা কাদার উপর তক্তা রেখে মঞ্চ বানিয়ে গোলন্দাজরা যাতে অভিনয় ঠিক দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করলেন, আবার শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্য সমস্ত মঞ্চটাকে ঢাকাঢাকি দিয়ে 'কামুফ্লাজ' বা ছদ্মবেশেরও সাহায্য নিলেন! সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড উৎসাহে অভিনয় দেখল। সমস্ত যুদ্ধ সীমান্তে এই রকম অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়।

আমাদের কাছে অন্তত সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার হল সোভিয়েট অভিনয় গোষ্ঠির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দল, মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিজ্ঞতা।

যুদ্ধ শুরু হবার পর এই দল দক্ষিণ যুদ্ধ সীমান্তের পিছনে ঘুরতে থাকে। দিনরাত্রি এরা বাকু তেল কলের মজুর, আহত সৈন্য ও কৃষ্ণসাগরের নাবিকদের মত অসংখ্য লোকের সামনে অভিনয় করে দর্শকদের অধিকার দেওয়া হয় পরবর্তী অনুষ্ঠান নির্বাচনের। সৈন্য, নাবিক ও তেলকলের মজুরেরা কি ধরনের জিনিস চাইল আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তারা দাবী জানাল শপাঁর সংগীতের সুরে বসানো নৃত্য-নাট্যের! হাল্কা আমোদ আহ্লাদের পরিবর্তে জনসাধারণ চাইল এমন সব জিনিস অন্য দেশে জাতি সংকীর্ণ গোষ্ঠির মধ্যেই যার সমঝদার মেলে। সোভিয়েটে সব থেকে উচ্চাঙ্গের নৃত্যও বোঝে ও সাগ্রহে উপভোগ করে তেলকলের মজুরেরাও।

গেরিলা নেতা আর্জিয়ানির সত্যকার বৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায় সাধারণ সোভিয়েট নাগরিকদের হৃদয়ে সংস্কৃতি অনুরাগের স্থান কোথায়। তাঁর একজন অনুচর একরাত্রে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে একটি ম্যাপ দেখাল এবং জার্মান সৈন্যবাহিনীর অনেক পিছনে একটা অত্যন্ত কঠিন ও বিপদজনক কাজ হাঁসিল করার পরিকল্পনা পেশ করল। আর্জিয়ানি রাজি হলেন। কিন্তু গেরিলা যোদ্ধা চলে গেলে তিনি ডাকলেন আর এক জনকে। তাকেও তিনি দিলেন ঠিক একই কাজ—তবে যাবার পথটা দিলেন পাল্টে।

দু দিন পরে সমস্ত গেরিলা দলের উদ্বিগ্নতা যখন চরমে পৌঁচেছে তখন দুই যোদ্ধাই ফিরে এল। তারা পেল প্রচণ্ড সম্বর্ধনা। উৎসাহে তারা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

"আমরা পেরেছি। আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল ও একত্রে আমরা কাজটা সেরেছি।"

কি সেই কাজ যার জন্য দুজন গেরিলা প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়েছিল?

সে কাজ হল মিথায়েলোভস্কয়ে নামক গ্রামে গিয়ে কবি পুস্কিনের কবরে একটি ফুলের মালা দেওয়া।

এই ঘটনাটি শুনে সোভিয়েট সুরস্রষ্টা মুরাডেলি বলেন—"দেশের মহাকবির প্রতি এদের সম্মান প্রদর্শনের এই প্রয়াস একটা সামরিক প্রচেষ্টার সমান হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। সূর্যরশ্মিকে যেমন চূর্ণ করা যায় না তেমনই এদের সংস্কৃতি অনুরাগও নষ্ট করা অসম্ভব।

সোভিয়েটের সর্বত্রই দেখা যায় "সংস্কৃতি-প্রাসাদ"। ইতিহাসে কখনও এ ধরনের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। সব সময়েই তার মালিক হত রাজারাজড়ারা। সংস্কৃতি ছিল মুষ্টিমেয় বিশেষ সুবিধাভোগীর সম্পত্তি। সোভিয়েট ইউনিয়নে সংস্কৃতি ও প্রাসাদ দুই-এরই মালিক কোটি কোটি মানুষ সমগ্র দেশবাসী।

ঐ আশ্চর্য দেশে "অবসর যাপনের প্রাসাদও" দেখতে পাবেন। শুধু ক্রিমিয়া ও ককেশাসেই শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের পরিকল্পিত চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ৫০০টি এই রকম প্রাসাদ আছে। এগুলি অসুস্থ মানুষের জন্য নয়। কর্মরত নারীপুরুষের জন্য। পরিশ্রান্ত হলে প্রতি বছর দু তিন বা চার সপ্তাহ কাল যে কেউ চমৎকার এক অবসর যাপন প্রাসাদে গিয়ে কাটাতে পারে—খরচ লাগে না এক পয়সাও সোভিয়েটে প্রাসাদ ও আরাম লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য!

বিপ্লবের আগে সমস্ত রাশিয়ায় ছিল মাত্র ২২২টি ক্লাব। এগুলিও আবার অভিজাতশ্রেণী, ধনিক ও জারের কর্মচারীদেরই দখলে ছিল। আজ সোভিয়েটে আছে ৯৫,০০০ ক্লাব। এর অর্ধেকেরও বেশী হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। সোভিয়েট তরুণেরা আবার নিজেদের জন্য খেলাধূলোর প্রাসাদ বানিয়েছে। পুরাকালের গ্রীসের মত সোভিয়েটের লোকেরা জানে যে পূর্ণাঙ্গ জীবন, সত্যকার সংস্কৃতিসমৃদ্ধ, আনন্দোজ্জ্বল অস্তিত্বের

জন্য প্রয়োজন সুস্থ, সবল দেহ। ঘরের বাইরের জীবন সর্বত্রই প্রচণ্ড উৎসাহ পেয়ে থাকে। খেলার মাঠে ফুটবল, বেস বল ও হকির মত প্রতিযোগিতামূলক খেলা চলে বিপুল জনসমাবেশের সামনে। বারটি বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঁচটি স্কুলে শুধু স্বাস্থ্যচর্চাবিদদের শিক্ষা দেওয়া হয়; কোনো বেতন- লাগে না এখানে। আসলে রাশিয়ার খেলাধূলোর সঙ্গে পয়সা কামানোর কোনো সম্পর্ক নেই। সমস্ত দেশে একজনও পেশাদার খেলোয়াড় নেই। খেলাধূলো হচ্ছে সমস্ত জাতির স্বাস্থ্য আনন্দের জন্য। 'খেলাধূলোর প্রাসাদে' সবার জন্যই আছে সাঁতার কাটার জায়গা, টেনিস কোর্ট, ঘোড়া চড়ার বন্দোবস্ত, নৌকা এমন কি সমুদ্রগামী 'ইয়টের'ও ব্যবস্থা। শিকারী ও মাছ ধরার উৎসাহীদের জন্য আছে অরণ্য-স্বর্গে যাবার বন্দোবস্ত। পাহাড় চড়ায় যাদের সখ আছে তাদের জন্য সপ্তাহান্তে ঘুরে আসা থেকে মাসাবধি কাল কাটাবার মত দল পাওয়া যায়। কোটি কোটি মানুষের জন্য আছে প্রাসাদ ও সব রকমের খেলা।

বিজ্ঞানের গোপন হাতিয়ারের সাহায্যে সোভিয়েটের মানুষ আজ নিজেদের জন্য এই আশ্চর্য নবজীবনের অধিকার লাভ করেছে।

এখানে একটু থেমে আমরা তলিয়ে দেখব সোভিয়েট জীবনের কয়েকটি দিকের কথা যা আমাদের কাছে মোটেই আশ্চর্য ব্যাপার নয়—এমন সব জিনিস যা রাশিয়া ও আমাদের দেশের প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিল্প, সংস্কৃতি ও খেলা থেকে আমরা এক মুহূর্তের জন্য জীবনের বাস্তব ব্যাপারগুলির দিকে চোখ ফেরাব 'জীবনযাত্রার মানের' দিকে, নীরস টাকা পয়সার হিসাবের দিকে।

বেশ জনকয়েক "বিশেষজ্ঞ" আমাদের জানিয়ে দিলেন যে লাল ফৌজের বিস্ময়কর লড়াই খুব সহজে এইভাবে বোঝা যাবে—সোভিয়েট জনগণ বিশ বছর ধরে তাদের সমস্ত শক্তি ও প্রায় সব টাকাই ব্যয় করেছে যুদ্ধের

উদ্দেশ্যে। তারা ঐ রকম আশ্চর্য ও বিজয়সংগ্রাম চালাতে পারল কারণ শুধু এ জন্যই তারা কুড়ি বছর ধরে সব কিছু বিসর্জন দিয়েছে।

এ কথা কি ঠিক ?

তথ্য দিয়ে মিথ্যার জবাব দেওয়া চলে। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানায়নের ফলে সোভিয়েট দুনিয়ার মধ্যে শুধু সব থেকে পরাক্রমশালী জাতিতে পরিণত হয় নি (হিটলারপদানত সমগ্র য়ুরোপের চেয়েও শক্তিশালী) তার ফলে সমস্ত জাতির জীবনযাত্রার মান, টাকা আনা পাই-এর হিসাবে তাদের আয় প্রচণ্ড রকম স্ফীত হয়ে উঠল।

১৯২৮ থেকে ১৯৩৬এর মধ্যে সোভিয়েট মজুরদের গড় বাৎসরিক বেতন ৭০০ থেকে ২,৭৭০ রুবলে পরিণত হল।

১৯৩৬ সালে সোভিয়েট মজুরদের মোট মজুরী দেওয়া হয় ৫৬২৫,০০,০০.০০০ কোটি রুবল। ১৯৪০ সালে এই অঙ্ক দাঁড়ালো ১৭৫০০,০০,০০,০০০ রুবল।

এই বৃদ্ধি হল নগদ টাকায়। এ ছাড়াও আমরা দেখেছি স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সব দিক দিয়েই জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করল।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ এই চার বছরে রাষ্ট্র ও ট্রেড ইউনিয়ন মজুরদের সেবায় মোট ৩২৫০,০০,০০,০০০ রুবল ব্যয় করল। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০এ এই অঙ্ক ওঠে ৪০০০,০০,০০,০০০ রুবলে।

সোভিয়েট সমালোচকরা আর একটি গল্প ছড়াচ্ছেন যে সে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের স্বাধীনতা নেই—ট্রেড ইউনিয়নগুলির অস্তিত্ব আছে শুধু কাগজে পত্রে।

তথ্য দিয়ে এ মিথ্যা কাহিনীর জবাব দেওয়া যায়। ট্রেড ইউনিয়ন সোভিয়েট দেশবাসীর সব কিছু অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত। সেখানকার

ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যসংখ্যা ১৯১৭ সালে ১৫,০০,০০০র কাছাকাছি থেকে ১৯৪০এ ২,৫৫,০০,০০০তে দাঁড়ায়। ইউনিয়নগুলি ছিল ৬০০০টি ক্লাব-দালান, ১,০০,০০০টি কারখানা-ক্লাব, ১৫,০০০ গ্রন্থাগার ও ১০,০০০ সিনেমার মালিক—খেলার স্টেডিয়াম, ব্যায়ামাগার, খবরের কাগজ ও গ্রন্থপ্রকাশ প্রতিষ্ঠানের কথাতো বাদই দিলাম। সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়ন হল সব থেকে প্রাণবান ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। শান্তির সময় সমস্ত জাতির অগ্রগতি ও নাৎসীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জয়লাভের কৃতিত্বের অনেকটাই এর প্রাপ্য।

আমাদের পক্ষে এ কথা বোঝা শক্ত নয়। সম্প্রতি আমরা দেখছি যুদ্ধের জন্য শিল্পশক্তির সর্বাঙ্গীন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের দেশেও ট্রেড ইউনিয়নগুলি কি করতে পেরেছে। শান্তি ও অগ্রগতির জন্যও ইউনিয়ম যে ঐ রকম কাজ করতে পারে তা বোঝা কি খুবই কঠিন।

এবার আমরা আর একটি কাহিনীর প্রসঙ্গে আসতে পারি। সোভিয়েটকে যারা সংশয়ের চোখে দেখে এটি হল তাদের বিশেষ প্রিয়। যুদ্ধের শেষের দিকে ও পরে কি হবে তারই সঙ্গে এ গল্পের যোগ আছে। সোজা কথায় ব্যাপার হল এই—রাশিয়াকে কি বিশ্বাস করা চলে? স্টালিনের আসল মতলব কি য়ুরোপ জয় ও গণতান্ত্রিক দুনিয়ার পরে সাম্যবাদ চাপিয়ে দেবার জন্য জবরদস্তি? এই সব প্রশ্ন তুলে কৌশলে সংশয়ের বীজ বপন করা হয়।

কিন্তু এর উত্তর দিয়ে আমরা এই বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করতে পারি। স্টালিনের কথার পুনরুক্তি করলেই চলবে। গত বিশ বছর ধরে জনসাধারণের বক্তৃতা, প্রতিশ্রুতি ও বিবৃতির যাথার্থ ও অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েটের লক্ষ্য সম্পর্কে স্টালিন দুনিয়ার সকলকে জানান :—

"য়ুরোপেই হোক আর এশিয়ায়ই হোক—পররাজ্য গ্রাস বা বিদেশীর পরে আধিপত্য—আমাদের এই ধরনের কোনো যুদ্ধকালীন মতলব নেই—থাকতেও পারে না। প্রথম লক্ষ্য আছে আমাদের দেশ ও দেশবাসীকে জার্মান-ফ্যাশিস্টদের কবল থেকে মুক্ত করা। শ্লাভ ও য়ুরোপের অন্য যে সব শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি আমাদের কাছ থেকে সাহায্যের প্রতীক্ষা করছে তাদের উপর আমাদের ইচ্ছা বা রাষ্ট্রসংগঠন চাপিয়ে দেবার কোনো যুদ্ধকালীন মতলব আমাদের নেই—থাকতেও পারে না। আমাদের উদ্দেশ্য হল হিটলারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করা ও তারপরে নিজেদের খুসীমত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এদের আপন দেশে নিজেদের জীবন যাপনের অধিকার সম্ভব করে তোলা। দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা চলবে না।"

বিকৃত করার উদ্দেশ্য নিয়েও কোনো সমালোচকের পক্ষে এই সোজা কথার কোনো নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় শুধু এই সহজ কারণেই যে এ কথা এতই সরল যে য়ুরোপ ও আমাদের দেশের সবাই এর অর্থ বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারে।

ধরুন এবার আমরা এতক্ষণ সোভিয়েট ও সেখানকার মানুষের কীর্তি সম্পর্কে যা কিছু বললাম তার একটা গড়পড়তা হিসাব নেবার চেষ্টা করি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ তাদের 'আশ্চর্য নূতন দেশে' ঠিক কি করছে ?

তারা প্রকৃতিকে মানুষের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করাচ্ছে। উদ্দেশ্য হল যাতে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর জন্য প্রাচুর্যের সৃষ্টি হয়। উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেকেই যাতে

সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়—পরিশ্রম হ্রাসের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি প্রয়োগ করে যাতে আমরা অবসর ও আরাম পাই—মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যাতে সমস্ত জাতির অধিকারে আসে এবং তারা যাতে মানুষজাতিকে যে নূতন ও গৌরবময় জীবনধারা সামনের দিকে টানছে তার রূপ স্পষ্ট দেখতে পায়।

বিশ বছরের সোভিয়েট ইউনিয়ন শিল্প ও সংস্কৃতির দিক থেকে আধুনিক জগতে প্রায় অতুলনীয় দুরবস্থা থেকে বড় বড় জাতিগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এই আশ্চর্য নূতন জাতি সারা দুনিয়াকে অবাক করে দিয়েছে।

নববিজ্ঞান সোভিয়েটকে "অপরাজেয়" হিটলারী বর্বরদের প্রতিহত করার মত সামরিক শক্তি যুগিয়েছে। সর্বাঙ্গীন ধ্বংস থেকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণতি ঘটেছে পঁচিশ বছরে!

মানুষের যোগ্য জীবন

"ভয় দেখিয়ে দুনিয়াকে শাসন করা যায়। মর্যাদার অর্থ হল নির্মমতা ও পাশব শক্তি। আমাদের জাতিকে যা কিছু রক্ষা করে তাই হল নীতিসম্মত—যা কিছু তার বিরোধী তাই দুর্নীতিমূলক। নিকৃষ্ট জাতির মানুষকে ধ্বংস করার আমাদের অধিকারের বিরুদ্ধতা করবে কে? সহজ প্রবৃত্তিই আমাদের জানায় যে আমাদের শুধু শত্রুকে পরাজিত করলেই চলবে না—তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে?

এ কথা বলেছিল কে? একজন উন্মাদ? সমাজদ্রোহী কোনো মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি?

এ কথা বলেছিল হিটলারের অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা ও নাৎসীদের অন্যতম নেতা ডারে। এই জীবটি ভীষণ হিসাব করে পুঙ্খানুপুঙ্খতার সঙ্গে সেই সব লোকদের লক্ষ্য প্রকাশ করছিল যারা দুনিয়াকে এমন যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনল যা নৃশংস হত্যা ও অমানুষিক পাশবিকতার দিক থেকে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত সংঘর্ষ ঘটেছে তাকে অনায়াসে ছাড়িয়ে যায়

শত শত বছর ধরে যুদ্ধবিগ্রহ বিভিন্ন জাতিকে বিধ্বস্ত করেছে। বর্বরেরা শান্তির দেশে হত্যা ও ধ্বংসের বন্যা বইয়েছে। বড় বড় শহর পরিণত হয়েছে ধ্বংস্তূপে। সমস্ত দেশবাসীকে নির্মূল করা হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসে কখনও কোনো পররাজ্যলোলুপের দল সমস্ত মানবতাকে নিঃশেষ করতে—সমগ্র দুনিয়ার পরে পাশবশক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এভাবে কোমর বাঁধেনি। সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এই মারাত্মক সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল সেই সব বিকারগ্রস্ত প্রাণীদের যাদের একমাত্র নীতি হল নরহত্যা।

দশ বছর আগে দুনিয়ার অন্যতম অগ্রগামী জাতি হিসাবে খ্যাত জার্মানী এমন একদল গুণ্ডার হাতে এসে পড়ে যে দুর্দান্ত অপরাধীরাও স্বপ্নে তার কল্পনা করতে পারবে না। সারা দুনিয়ার চোখের সামনে এই গুণ্ডারা জার্মান সভ্যতা বিনষ্ট করতে আরম্ভ করল। সব মানুষকে পশু জ্ঞান করে এরা নির্মম ও বিবেকশূন্য চিত্তে জার্মান জাতিকে পশুত্বে পরিণত করতে উঠে পড়ে লাগল। অগ্রগতির ইতিহাসে জার্মানরা যে যে কারণে স্থান পেয়েছিল নাৎসীরা তার সবগুলিই অস্বীকার করল।

তারা ধ্বংস করল পরিবার, বিবাহের জায়গায় জার্মানদের মধ্যে প্রচলন করল বর্ণ সাংকর্য ও "নিকৃষ্টজাতিভুক্ত" নরনারীর প্রজনন-শক্তির বিনষ্টি। তারা নষ্ট করল বিদ্যালয়গুলিকে— শিক্ষার জায়গায় সেখানে নিয়মিতভাবে বিদ্বেষ প্রচার শুরু হল। বুদ্ধিকে তারা করল উপহাস—মাথায় তুলল জঘন্যতম পাশব প্রবৃত্তিগুলিকে। মানুষের ব্যক্তিত্বের তারা কণ্ঠরোধ করল—যারা নতি স্বীকার করল না বা নীরব রইল না নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করা হল। ধর্মকে গালাগালি দিয়ে তারা রক্তপাতের জয়গানে মত্ত হয়ে উঠল।

এ সব কিছুই নাৎসী দানবেরা করল যথাসম্ভব—দুষ্টবুদ্ধি অত্যাচার, ও বিভীষিকার যত রকম যন্ত্র বানাতে পেরেছে তারই

সাহায্যে। তারা লক্ষ লক্ষ জার্মানকে পশুতে পরিণত করতে সমর্থও হল। কিন্তু অরণ্যের পশুর চেয়ে এরা অনেক বেশী সাংঘাতিক কারণ নাৎসী পশুরা শুধু পাশবিকতায়ই পোক্ত ছিল না—তারা যান্ত্রিক যুদ্ধের ভীষণতম হাতিয়ার ব্যবহারেও দক্ষ ছিল। প্রায় সমস্ত পুরুষদের যন্ত্র-মানুষের পালে পরিণত করা হল। তাদের গায়ে ছাপ লাগানো হল 'স্বস্তিকার'। মগজের জায়গায় রইল শুধু নর-রক্তপাতের শাণিত প্রবৃত্তি।

এ সব যখন চলছিল সভ্য পৃথিবী তখন চুপচাপ বসে দেখছিল। মস্ত লজ্জার কথা অনেকে নাৎসী বর্বরতার মধ্যে তখন সমালোচনার কিছু খুঁজে পায়নি। আজ বিবেক নিশ্চয়ই জ্বলন্ত শিখার মত তাদের অন্তর্দাহ ঘটাচ্ছে। এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার—বাইরেকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পরামর্শ, অর্থ ও প্রভাব দিয়ে নাৎসীদের দ্বারা জার্মানীর পাশবিকতা সাধনের কাজে সাহায্য করেছিল। সর্বোচ্চ স্থানেও বর্বর হিটলার বন্ধু, এমন কি ষড়যন্ত্র করবার মত লোক পেয়েছিল।

আর, সারা দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ থেকে যে সাবধানবাণী ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত রইল যতদিন না নাৎসী দস্যুরা বিপুল সামরিক শক্তি সমাবেশ করে ফেলতে পারল। তখন কিন্তু বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে।

হিটলার তারপর মানবতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ধ্বংসের শক্তি প্রয়োগ আরম্ভ করল। এ সবের প্রস্তুতি সে প্রকাশ্যেই করেছে—পাশবিক, উন্মত্ত বক্তৃতায় এর উদ্দেশ্য বরাবর সে ঘোষণা করেছে।

একে একে দুনিয়াকে হতচকিত করবার মত আকস্মিকতার সঙ্গে নাৎসী বিশ্বাসঘাতকতা ও আক্রমণ য়ুরোপের বড় বড় দেশগুলিকে পর্যুদস্ত করল। পরাজিত দেশগুলির পরে যে লুণ্ঠন ও অত্যাচার চলল তারপর হিটলার-

পন্থীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আর সংশয়ের অবকাশ রইল না। নিশ্চিত বোঝা গেল যে তারা নিজেদের ছাড়া সমস্ত জাতির ধ্বংস বা পরাধীনতা চায়—সমস্ত জগৎকে পরিণত করতে চায় এক বিরাট দাসত্বভূমিতে।

এই জঘন্য উদ্দেশ্যটাকে ঢাকবার জন্য হিটলার ও তার 'আর্য' বন্ধু জাপানীরা নানারকম নির্মম কপটতা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিল। যে সব জাতিকে সে আক্রমণ করল তাদের প্রত্যেকের পরেই দোষারোপ করা হল যে তারা জার্মানী আক্রমণ উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করছে। শান্তিকামী জাতি-দের উপর সব থেকে রক্তাক্ত অভিযানের সাফাই গাওয়া হল এই সুরে। যে সব স্বাধীন জাতি বাকী রইল তাদের কাছে হিটলার গলাবাজী করত যে নাৎসীরা সমাজতন্ত্রবাদী ও তার ধনিকদের বিরুদ্ধে চাষী-মজুরের স্বার্থরক্ষা করে। এই মিথ্যাচার দিয়ে হিটলার এই কথাটাই গোপন করতে চাইল যে তার চেলারা হল মস্ত পুঁজিদার যারা সমস্ত য়ুরোপকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধেছিল-জার্মান ব্যাঙ্কার ও ভূস্বামীদের তহবিল সেখানকার রক্তমাখা লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যে ভারী করে তুলতে। সবশেষে হিটলারপন্থীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মের ধ্বজাধারী বলে প্রতিপন্ন করতে চাইল ঠিক তখনই যখন হাজার হাজার নিহত বুদ্ধিজীবী, ধর্মযাজক, পাদ্রীর কবরের পরে তাদের নিষ্ঠুর পদক্ষেপ ধ্বনিত হচ্ছিল।

এইভাবে নাৎসীরা প্রমাণ করল তাদের মানব বিদ্বেষ। তারা ভাবল মিথ্যা ও নির্মমতা দিয়ে বুঝি সমগ্র মানবতাকে পর্যুদস্ত করা যাবে। নিজেদের পাশবিকতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ায় তারা মনে করল অন্য মানুষদেরও বুঝি জবরদস্তি করে আপনাদের স্তরে টেনে নাবানো যাবে—মানব মর্যাদা গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে ভয় দেখিয়ে।

কিন্তু হিসাবে তাদের ভুল ছিল। আপন হৃদয় থেকে মানবতাবোধের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে পারলেও এই জীবেরা মানুষের স্বাধীনতা-

পিপাসা ও বীরত্বমণ্ডিত আদর্শনিষ্ঠা চূর্ণ করতে পারল না। চেকো-স্লোভাকিয়ার মানুষকে চাবুক মেরে পোষ মানানো গেল না! বিভীষিকা সত্ত্বেও পোল্যাণ্ড নিস্তব্ধ রইল না। গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া অসম্ভব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আঘাত হানল! হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও নরওয়ে তাদের আশার শিখা অনির্বাণ রেখেছিল।

পশুশক্তির অপরাজেয় সামরিক যন্ত্রের কাছে যখন বৃটিশেরা নতি স্বীকার করল না তখন হিটলার সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ঐ দ্বীপপুঞ্জের পরে অবিশ্রান্ত নৃশংস বিমান আক্রমণ চালাল। তবু লাভ হল না।

কাপুরুষের মত আকস্মিক আক্রমণ কৌশল প্রয়োগ করে জাপান যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল তখন ওয়েক দ্বীপে মুষ্টিমেয় মার্কিন সৈন্য অসংখ্য শত্রুসৈনার কাছে হার মানার চেয়ে প্রাণ দেওয়া শ্রেয় বোধ করল! ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন ও দেশীয় সৈন্যরা বহুদিন বর্বরদের অবিশ্রান্ত অভিযান ঠেকিয়ে রেখেছিল।

কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা কেউই চক্রশক্তির নিষ্ঠুরতম আঘাতের সামনে ভয় পায়নি।

তবু সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হিটলার য়ুরোপের সমগ্র শিল্প ও সামরিক শক্তি সংহত করে যে বিরাট ও প্রচণ্ড আঘাত করল তার তুলনায় এসব আঘাতও মৃদু বলতে হবে। ইতিহাসে এত বড় আক্রমণ আর কখনো দেখা যায়নি। কখনো কোনো জাতি ২০০০ মাইল জোড়া সীমান্তের প্রত্যেক জায়গায় এরকম অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়নি। কোনো যুগে মঙ্গোল ও হুনেদের আমলেও কোনো আক্রমণকারী এমন অকথ্য অত্যাচার চালায়নি। বনের পশুকেও সে অত্যাচার লজ্জা দিতে পারে।

হিটলারপন্থীরা, তাদের পথে যা পড়ল নিঃশেষে সব ধ্বংস করল। নারীর পরে অত্যাচার ও শিশু হত্যা তারা করল দু-একটা নয়...দলে

দলে উন্মত্ত তাণ্ডবে মেতে হাজার হাজার বেসামরিক লোকদের দিয়ে তারা বিরাট কবর খোঁড়াল ও তারপরে তাদের হত্যা করল। শত শত জীবন্ত ব্যক্তিকেও কবর দেওয়া হল। শত শত ছেলে মেয়েকে তারা স্কুলে ডেকে এনে দরজা বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দিল। হাজার হাজার বয়স্ক নর-নারীকে সুদূর উত্তরের তুষারপাতের মুখে তাড়িয়ে যন্ত্রণা দিয়ে মারল। মানুষের দেহধারী এই পশু কুড়ুল, বেড়াজাল ও পিস্তলের সাহায্যে সোভিয়েটের মানুষকে পর্যুদস্ত করতে চাইল। তবু পারল না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ যখন আক্রমণ ঠেকাতে আরম্ভ করল তখন দুনিয়াকে বশ মানানোর নাৎসী স্বপ্ন এমন এক প্রতিরোধের ঘায়ে চুরমার হয়ে গেল যাতে সমস্ত জগত চমৎকৃত হল। পশুদের অপরাজেয় সমর-যন্ত্রের গতি প্রথমে মন্দীভূত হল—তারপর মস্কো ও লেনিনগ্রাদের দরজায় এসে একেবারে হল রুদ্ধ। দুনিয়াতে তুলনা মেলে না এই রকম ন-মাসের নৃশংস লড়াই-এর। হিটলার যা সৈন্য হারাল...প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুরো চার বছরেও কাইজারকে তা হারাতে হয়নি। এই প্রচণ্ড যান্ত্রিক বাহিনী, বোমা ও গোলার এই নরক, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নাৎসীদের অন্তহীন নির্মমতার পাশে পূর্ব যুগের সমস্ত তড়িৎ আক্রমণ সামান্য মহড়ার মত বোধ হল। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট সৈন্য, বৈমানিক, গেওরিলা, নারী, তরুণ ও ছোটরা প্রাণ হারালো। গোটা অঞ্চলের পর অঞ্চল শত্রু অধ্যুষিত ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। লাল ফৌজকে পিছু হটতে হল। কিন্তু তার পল্টন ছত্রভঙ্গ হল না। লাল ফৌজের লাইন একবারও ভাঙল না।

তারপর ১৯৪৩ সালের শীতকালে, স্টালিনগ্রাদের আশ্চর্য বিজয়ের সূত্র ধরে লাল ফৌজ শুরু করল তার বিরাট অভিযান। তখন প্রকাশ

পেল শাপস্নিকভের বিরাট পরিকল্পনা—যুদ্ধ শেষ হওয়ার মুখে শত্রুর থেকে প্রবল হবার পরিকল্পনা। লাল ফৌজ লড়াই-এর যে নূতন অস্ত্রশস্ত্রের রিজার্ভ বার করল তাই দেখে সারা দুনিয়া চমকে গেল আর হিটলারপন্থীরা হয়ে পড়ল আতঙ্কিত। স্টালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর ককেশাস, রস্টভ, খার্কভ ও কার্স্কের বিপুল পরাজয় সামরিক ইতিহাসে একেবারে অভূতপূর্ব। ১৯৪৩ সালে লাল ফৌজ যে রকম বিজয় গৌরব অর্জন করে কোনো সৈন্যবাহিনী কখনও সে রকম পারেনি।

এই বইতে আমরা দেখেছি কি ভাবে সোভিয়েট এই বিরাট সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, কেমন করে দশ বছরে ফ্যাসিজমের প্রত্যাশিত আঘাত ঠেকাবার জন্য বিজ্ঞানের হাতিয়ার শানানো হল। আক্রমণ যখন এল তখন তার পিছনে য়ুরোপের সমস্ত অগ্রগামী দেশগুলির শিল্পশক্তি ছিল। হাতিয়ার তবু তার মান রাখল।

কিন্তু এ হাতিয়ার যারা চালাল তারা কি ধরনের মানুষ? হিটলারের সোভিয়েট ধ্বংস করার বড়াই চূর্ণ করার মত সাহস ও স্থৈর্য তারা পেল কোথা থেকে? সাহসের কোন্ পুঁজি থেকে লক্ষ লক্ষ বীরের উদ্ভব হল? সোভিয়েট ইউনিয়নের মানুষ মরিয়া হয়ে লড়েনি। স্বদেশ রক্ষা করছিল বলেই তারা টিঁকে থাকেনি। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের চাবুকের ঘায়েও তারা যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়নি।

সোভিয়েট জনগণ অর্থাৎ যে ১৮ কোটি মানুষ একদিন শুধু হাতে জার শাসনের সশস্ত্র বিভীষিকাকে উৎপাটিত করেছিল—তারা যুদ্ধে গেল—কেন লড়ছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে। যে স্বাধীনতা তাদের কাছে বাস্তব সত্যের রূপ নিয়েছিল—যে স্বাধীনতা দিয়েছিল তাদের নূতন, মহিমান্বিত জীবনের অধিকার আর অবারিত করেছিল অনন্ত উন্নতির পথ—তাই বাঁচাবার জন্য তারা লড়াই চালাল।

আমাদের পক্ষে এ কথা বোঝা অত্যন্ত দরকার কেন সোভিয়েটের লোক মস্ত এক সৈন্যবাহিনীর মত লড়াই করেছে। তাদের সঙ্গে হিটলার যে সব জাতি ও লোকদের পরাভূত করেছিল তাদের তফাৎ কোথায় ?

সোভিয়েট সৈন্যরা ও বেসামরিক লোকেরা জানত যে একটা কারখানা, খনি, রেলওয়ে বা দোকানও হিটলারের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে একটুও মুনাফা করছে না। সোভিয়েট ইউনিয়নে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা হয়নি। রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লোকের লাভের অঙ্ক ফেঁপে ওঠেনি।

তাদের মজুরেরা উৎপাদনের গতি হ্রাস করা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা মনে করল। যুদ্ধ শেষ হলে তাদের বেকার হওয়ার চিন্তা ছিল না বলে সোভিয়েট মজুরেরা সে কাজ দীর্ঘ দিন চলুক এমন কথা ভাবতে ঘৃণা বোধ করে। যুদ্ধের আগেও তাদের নিজেদের ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তা ছিল—পরেও থাকবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সৈন্য, বৈমানিক ও নাবিকেরা লড়াই-এর সময় কত মাইনে পাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কারণ পরে বসে খাবার মত টাকা জমাবার চিন্তা তাদের পাগল করত না। পঙ্গুত্ব বা মৃত্যুর সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে তারা পারত—স্ত্রী পুত্র পথে দাঁড়াবার ভয় তাদের ছিল না।

সোভিয়েট তরুণী ও মেয়েরা সৈন্যবাহিনীতে প্রেমিক বা স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে—ফ্রণ্টে শত্রুর সামনে এগিয়েছে সাহসে বুক বেঁধে। কারণ তারা লড়ছিল এমন এক জীবনের জন্য যা তাদের দিয়েছে সম্পূর্ণ সমান অধিকার, সব রকম হীনতার পঙ্ক থেকে তাদের দিয়েছে মুক্তি—বিবাহকে ছুটি সমকক্ষ মানুষের মিলনে পরিণত করেছে আর পরিবারকে দিয়েছে নূতন মর্যাদা ও সম্মান।

সোভিয়েট যৌথকৃষির নরনারী আশ্চর্য রকম উৎপাদন বাড়াতে পেরেছে ; শত্রুর অগ্রগতির পথে তারা শেষ শস্য কণাও বিনষ্ট করেছে ; পুড়িয়েছে ঘরবাড়ী নাৎসীরা যাতে আশ্রয় না পায়। কিন্তু কেন করেছে এই আত্মত্যাগ ? কারণ সে দেশে চাষীর ভয় নেই কৃষি সংকটের, তার দুর্গতি থেকে কারো ফেঁপে 'ওঠার সম্ভবনা নেই।' কৃষি দেশের পক্ষে প্রয়োজন—চাষী জনসংখ্যার অন্যান্য অংশের মতই জাতীয় আয়ের ভাগীদার। তার কষ্টে অর্জিত অধিকার, স্বচ্ছন্দতর জীবন-যাত্রা ও স্বাচ্ছন্দ্য বাঁচাবার জন্য সোভিয়েট চাষী ফসল ফলিয়েছে আবার প্রয়োজন হলে ধ্বংস করেছে সে ফসল, যোগ দিয়েছে গ্যেরিলাবাহিনীতে। যুদ্ধ যে প্রচণ্ড আত্মত্যাগের দাবী জানালো তার মুখোমুখি হয়ে আর আক্রমণকারীকে পর্যুদস্ত করতে যে বিপুল পরিমাণ সাজসরঞ্জাম ও টাকা লাগছে তা দেখেও সোভিয়েট জনসাধারণ এই বিশ্বাস নিয়ে লড়ল যে শান্তি যখন আবার করায়ত্ত হবে তখন তাদের সরকার সমস্ত জাতীয় আয় খরচ করবে সংস্কারের কাজে, যা কিছু নষ্ট হয়েছে সবই আবার গড়া হবে আর জয়লাভের জন্য যে লড়েনি বা খাটেনি তার ভাগ্যে এক পয়সাও জুটবে না।

সোভিয়েট ইউনিয়ন জানে যে জয়লাভের পর তাদের সীমানার মধ্যে খাদ্যের জন্য সারি দিতে হবে না। মানুষ শিখেছে কি করে অন্নসত্রের জায়গায় সংস্কৃতি ও প্রমোদ সৌধ গড়তে হয়।

তারা আবিষ্কার করেছে কি ভাবে ব্যক্তিগত সামর্থকেই জীবনে সুযোগলাভের একমাত্র উপায় করা যায়। তাই তারা লড়াই-এ গেল তাদের সন্তানদের এমন দুনিয়ায় বাঁচবার অধিকার কায়েম করার জন্য যেখানে পুঁজির সুবিধা ও শক্তি হয়েছে খর্ব আর যেখানে কাজ, নিষ্ঠা ও শক্তি দিয়েই শুধু সম্মানের অধিকার জন্মায় !

বর্ণবিভেদ নেই, 'জঘন্য বিদেশীর' প্রতি ঘৃণা নেই, জনসমাকীর্ণ নোংরা বস্তি নেই, চিকিৎসাহীন রোগী নেই, সামাজিক অপরাধ, পাপ ও বেশ্যাবৃত্তি নেই, নিরপত্তাহীনতার ছায়ায় কালো জীবনভর মেহনত নেই, নেই শ্রান্তিভারে দুর্বহ ও দৈন্য-পীড়িত বার্ধক্য। এ সব গ্লানি সোভিয়েট দূর করেছে। আর তাই সেখানকার মানুষ মৃত্যুপণ করে লড়েছে জঘন্য নাৎসীদের বিরুদ্ধে যারা নূতন রাশিয়ায় আবার আনতে চায় ঘৃণ্য অতীতের গ্লানি।

এই সব যা কিছু অর্জন করা গেছে, যে স্বপ্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে, যত রকম স্বাধীনতার সন্ধান মিলেছে...এই নূতন জীবনের জন্যই লড়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। বিজ্ঞানের হাতিয়ার সজ্জিত ও তাদের ব্যবস্থায় চরম বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সোভিয়েটের জনসাধারণ এমন সব শক্তি, সাহস ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিচ্ছে মানুষের ইতিহাসে যার কথা চিরকালের মত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে!

আমাদের প্রয়োজন তাদের মত দৃষ্টির। বর্বরদের হাত থেকে আমাদের জীবনযাত্রা বাচাবার বিরাট সংগ্রামে আমরা আবিষ্কার করব স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির যাথার্থও। সোভিয়েট ইউনিয়নের মানুষ যেমন তাদের মহান সাধারণতন্ত্রের মাটি থেকে সমস্ত শোষণের অবসান ঘটিয়েছে তেমনই আমাদের জাতিদেরও আমাদের দেশে ও দুনিয়ার দুর্গত দেশগুলিতে সত্যকার মুক্তি আনতে হবে। আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে যে হিটলারপন্থী ও তাদের বন্ধুরা একেবারে বিনষ্ট হয়েছে—যাতে আবার সেই পশুরা না শক্তি অর্জন করে।

সভ্যতার শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য সোভিয়েটের নর-নারী ও শিশু সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। বিধবা ও অনাথের সংখ্যা সেখানে কোটির ঘরে।

শৌর্য ও শোকের কি ভয়ংকর বন্ধন আমাদের সোভিয়েট ইউনিয়নের মানুষের সঙ্গে মিলিয়েছে!

সহকর্মী হিসাবে আমরা তাদের উদ্দেশে হাত বাড়ালাম। আমরা তাদের নমস্কার জানাই। রক্ত ও অশ্রুর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরা তাদের সঙ্গে বাঁধা।

কারণ আজ আমরা জানি যে পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে যে মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তারা প্রাণ দিয়েছিল আমাদের জন্যও।

কিন্তু চোখের জলে তাদের জন্য শোক জানিও না কারণ তারা অপরাজেয়—মৃত্যুর মধ্যেও বীরত্বমণ্ডিত! এই মানুষেরা অমর। তাদের দেহ থেকে ঝরা রক্ত আজ ভবিষ্যতের ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত!

কানাডার কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে লেখা
ডাইসন কার্টারের
খোলা চিঠি

মার্কস্‌বাদের পথে কেন এলাম

প্রিয় টিম,*

আমাদের প্রথম সাক্ষাতের পর বহুবার আমরা হাতে হাত মিলিয়েছি। আজ আমি নিশ্চয় জানি যে আমার হাতের পর তোমার মুঠো হবে আগের চেয়েও অনেক বেশী জোরালো। এখন আমরা শুধু বন্ধু নই —আমরা কমরেডও। তোমায় লিখতে বসেছি এই কথা বলবার জন্য যে বহু বছরের চিন্তার পর আমি লেবার প্রোগ্রেসিভ পার্টিতে † (LPP) যোগ দিয়েছি।

অন্য সবার চেয়ে, টিম তুমি বেশী জানো কতদিন ধরে কত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি এই কাজটি করবার কথা ভেবেছি। আমার পক্ষে এ একটা সাময়িক লোক-দেখানো ব্যাপার নয়। কেন আমি কানাডার মজুর পার্টি, মার্কস্‌বাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের পার্টির সভ্য হয়েছি সে কথা এখন তোমার কাছে খুলে বলতে পারলে চমৎকার হত। কিন্তু আমরা আছি প্রায় ২০০০ মাইল দূরে। তাই এ চিঠি মারফৎই সারতে হবে।

এক কথায় আমি LPP তে যোগ দিচ্ছি কারণ কানাডার এইই হল একমাত্র পার্টি যা আমাদের ডোমিনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছে, একমাত্র পার্টি যা কানাডাবাসীকে সামনের সংগ্রামে ও শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের পথ দেখাতে পারে।

* টিম বাক—কানাডার বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক।

† কানাডার কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনী হওয়ায় বর্তমানে লেবার প্রোগ্রেসিভ পার্টিই কম্যুনিস্টদের সংগঠন।

আমার কাছে এর অর্থ হল এই যে LPP সমাজতন্ত্র কি ও কেমন করে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব তা সঠিক জানে। বহু বুদ্ধিজীবী, মজুর, চাষী, বৃত্তিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মত আমিও অনেকদিন দিন ধরেই এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে ধনতন্ত্র এখন অচল আর সমাজতন্ত্র হচ্ছে উন্নততর সমাজ। বহু বছর এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আস্থার রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য কি তা আমি ধরতে পারিনি। কিন্তু জীবনের গতি, মার্কস্‌বাদ অধ্যয়ন এবং আমার লেখা ও বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম—অবিশ্রাম সত্যানুসন্ধানই যে সব কিছুর সমন্বয় সাধন করছিল এ সব মিলেই আমার ধারণাশক্তিকে উন্নততর স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। এখন আমি পার্টিতে যোগ দিচ্ছি কারণ আমি জানি সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করার অর্থ কি।

সমাজতন্ত্র কানাডায় ধনবাদী রাষ্ট্রের অবসান ঘটাবে আর তার জায়গায় আনবে নূতন এক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র গড়বে তারাই—উন্নততর, শ্রেণীহীন সমাজ সংগঠনে যাদের ঐতিহাসিক অধিকার—হাত ও মাথা চালিয়ে যারা সৃষ্টি করে সেই সব নরনারী। এর ফলে কানাডায় ঘটবে আমূল পরিবর্তন।

প্রথমত পুঁজিদার ও তাদের লুব্ধ একচেটিয়া ব্যবসার দ্বারা মজুর, চাষী ও মধ্যশ্রেণীর শোষণ শেষ হবে। এখানে আপোষের কথা উঠতেই পারে না। কানাডার বিরাট উৎপাদন যন্ত্র, যানবাহন ব্যবস্থা, শক্তি উৎপাদক কারখানা, সরবরাহের যন্ত্রপাতি, শিল্পে টাকা যোগানোর ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও এই ধরনের জিনিসগুলি মুষ্টিমেয় লক্ষপতি শাসকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কর্মরত মানুষের রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হবে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী ছাড়া সমস্ত সম্পত্তি হবে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি—তার উপরে অধিকার থাকবে সমস্ত জনগণের;

আর জমি চিরদিনের বন্দোবস্তে যারা চাষ করে তাদের ইজারা দেওয়া হবে। অন্য লোকের মেহনত থেকে ব্যক্তিবিশেষের মুনাফা কামানোর অধিকার তাই হঠাৎ খতম হয়ে যাবে। ধনবাদী সমাজের যে অন্তহীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্মমতার বিরুদ্ধে দুশো বছর ধরে মানবধর্মীরা প্রতিবাদ করে আসছেন তখনই তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এ ছাড়াও সমাজতন্ত্র মানুষের প্রয়োজন ও আমাদের বিপুল দেশের অশেষ উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে যুক্তিসঙ্গতভাবে কানাডার উৎপাদন সংগঠিত করবে। যারা মেহনত করে তাদের সচেতন ইচ্ছাই হবে এর নিয়ামক। এর ফলে সোভিয়েটের মত এখানেও ক্রমেই উন্নততর জীবনযাত্রা সম্ভব হবে। আমাদের শিল্প ও কৃষি ইতিমধ্যেই যান্ত্রিক দক্ষতা ও লাভের দিক দিয়ে দুনিয়ার সব থেকে শ্রেষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। সমাজতন্ত্র—শোষকদের দূর করে যারা এর স্রষ্টা সমস্ত লাভকে সেই জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান আয়ে পরিণত করবে আর আরো বাড়িয়ে তুলবে উৎপাদন। গ্রামে ও শহরে আমরা দারিদ্রের বিরুদ্ধে চালাবো সামগ্রিক যুদ্ধ। মানুষ যা চায় অথচ পয়সায় কুলাতে পারে না—পরিচ্ছন্ন বাড়ী, সুখাদ্য, কাপড়জামা, গাড়ী, রেডিও, রেফ্রিজারেটার, ছুটি কাটাবার জায়গা, হাসপাতাল ও ক্লিনিকের ব্যবস্থা—এ সবই অনায়াসে বিজ্ঞান ও এঞ্জিনীয়ারিং-এর পরিচালনায় এখনকার সমাজ-বিরোধী সংকীর্ণতা পেরিয়ে কল্পনাতীতভাবে তৈরী ও ভাগাভাগি করে নেওয়া সম্ভব।

আরো কথা আছে। কানাডায় সমাজতন্ত্র আনতে পারলে সকলের কাছেই জ্ঞান ও সংস্কৃতির দ্বার অবারিত করা সম্ভব হবে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষের সব থেকে মহান স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে আরম্ভ করবে। সে স্বপ্ন হল মানুষের মেহনত ও বুদ্ধির প্রচণ্ড শক্তিকে

সংকীর্ণ জীবন-সংগ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়ে নূতন দুনিয়া গড়ার বীরত্ব-মণ্ডিত কাজে নিয়োগ করা। বহু আগেই অস্পষ্টভাবে যে দুনিয়ার স্বপ্ন দেখা হয়েছিল কিন্তু পূর্ববর্তী কোনো সভ্যতায়ই তা সম্ভবপর হয়নি। এখন বিজ্ঞান ও সৃষ্টিকলার অগ্রগতির ফলে চির উন্নতিশীল এ দুনিয়া গড়া সম্ভব। '

কানাডাবাসীকে বিশেষ করে আমার বই "সোভিয়েট বিজ্ঞানের" মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন—যে দেশের নূতন বাস্তব জীবনযাত্রা প্রণালী শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অশেষ সৃষ্টিশক্তির উৎস উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার সত্যকার চিত্র দেবার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি গৌরবান্বিত। শুধু সেখানেই নয়া দুনিয়ার সুন্দর রূপ স্পষ্ট দেখা যেতে পারে। সেখানে অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারত্ব সম্পূর্ণ দূর হয়েছে—জাতি ও বর্ণের মধ্যেকার বিদ্বেষের জায়গায় সেখানে এসেছে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক আর সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সু-উচ্চ আদর্শ, নূতন, সাহসী, আশ্চর্য অকুতোভয় জাতিগুলির অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সত্যই মানুষের আশার বাস্তব প্রতীক। শুধু সেখানেই ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতের চেহারা।

টিম, আমার কাছে ভবিষ্যতের কথা শুনতে শুনতে তুমি অর্ধেক রাত কাবার করে এনেছ। এবার আমি বলতে চাই যে কথা তার সম্পর্ক একেবারে মাটির সঙ্গে। কেন একজন বৈজ্ঞানিক বা লেখক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইএ যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিতে চায়?

১৪ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম গবেষণা করতে করতে আমি সোভিয়েট বিজ্ঞান সম্পর্কে যা কিছু পেলাম তাই পড়া শুরু করি। ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর—পৌছলাম ইতিহাসের রাজ্যে, দর্শনের

মধ্যেও। দেখলাম আমার অধ্যাপকেরা বিজ্ঞানের যে প্রাণহীন ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন তা কতদূর বিকৃত। আবিষ্কার করলাম যে আমার অধ্যাপকেরা যার সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেই হার্জেন হলেন শ্রেষ্ঠ বস্তুবাদী ও বিপ্লবীদের অন্যতম। রাসায়নিক মেণ্ডেলিফ যিনি উৎপাদনের পৌনঃপুনিকতার নিয়ম আবিষ্কার করে বিজ্ঞানচিন্তার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী কীর্তি অর্জন করেন তাঁকে আমার কাছে শুধু আণবিক ওজন নিয়ে ব্যস্ত একালষেঁড়ে মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। আমি দেখলাম মেণ্ডেলিফ ছিলেন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একজন জোরালো প্রবক্তা। আমাদের বলা হয়েছিল অক্সিজেন আবিষ্কর্তা, ইংরাজ রাসায়নিক প্রিস্টলি ছিলেন একজন "নন-কনফরমিস্ট" পাদ্রী। আসলে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী ও আরেকজন বিপ্লবী বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বন্ধু।

ধীরে ধীরে আমার জাগ্রতির ধারা বয়ে চলল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্যালিলিও থেকে ডারউইনের মধ্যে দিয়ে হলডেন পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের বিদ্যায়তনিক মহল যে সব রহস্যময়তা ও গোঁড়ামির দ্বারা আচ্ছন্ন তার জের কাটানো কঠিন ব্যাপার। কানাডার বৈজ্ঞানিকদের এক বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে যে তাঁরা জনসাধারণের 'উপরের তলায়'— রাষ্ট্রনীতি থেকে দূরে থাকার ভান করেন এমন কি শিল্পকলার প্রতি খানিকটা বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে। আমি যখন লেখা শুরু করলাম তখন আমায় উপেক্ষা ও ক্রমশ তীব্রতর সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। প্রথম কারণ জনসাধারণের বোধগম্য করে বিজ্ঞানের "পতন" ঘটাচ্ছি বলে আর তারপর মুনাফার ধ্বংসোম্মুখ মন্দিরে বিজ্ঞানকে আটকে রাখার জন্য ধনতন্ত্রকে দায়ী করতে সাহস হওয়ার জন্য।

বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী বিভাগের জনকয়েক

বৈজ্ঞানিক মুখপাত্র জ্ঞানচর্চার জগতে ও বৃত্তিগতভাবে আমায় অপদস্থ করতে চেষ্টা করেন। কয়েকবার তাঁদের এ চেষ্টার ফল হয় উল্টো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে সেবারকার কথা যখন তাঁরা অপরিচিত এক ইংরাজ ডাক্তার ও তাঁর 'অসম্ভব' ওষুধ সম্পর্কে লেখা আমার 'আজগুবী' রচনার বিরুদ্ধে সম্পাদকের কাছে প্রতিবাদ জানান। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ও পেনিসিলিন সম্পর্কে ঐটি হল প্রথম লেখা। আবার ১৯৪৩ সালে কয়েকজন এঞ্জিনীয়ার আমায় পাগল ঠাওরান এই জন্য যে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে অভিনব গ্যাস টারবাইন একদিন এরোপ্লেনে ব্যবহৃত হবে। আজ ঐ টারবাইন আগেকার সমস্ত মোটরকে বাতিলের পর্যায়ে ঠেলে ফেলেছে আর হাজার হাজার প্লেনে যুগিয়েছে যান্ত্রিক শক্তি।

উচ্চপদস্থ যন্ত্রবিদদের এই রকম প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের আমি আরো আধ ডজন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি। কিছুদিন আগে হার্ভার্ড মানমন্দিরের খ্যাতনামা পরিচালক ডাঃ হার্লো শ্যাপ্‌লি চমৎকারভাবে এর সার কথাটা বলেন যখন তিনি আমাদের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের "গোঁড়ামিকে প্রায় রোগের পর্যায়ভুক্ত" বলে অভিমত প্রকাশ করেন ও দেখান যে তাঁরা জনসাধারণের কাছে সুজাসুজি কিছু বললে বৃত্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে মনে করেন। কিন্তু শ্যাপ্‌লি দেখছেন না কেমন করে এ ব্যাপার হল। অভিজ্ঞতা থেকেই আমি জেনেছি এর কারণ।

আজ চাষী, মজুর, মধ্যবিত্ত সবার কাছেই বিজ্ঞানের বিরাট কীর্তি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যুদ্ধের জন্য বিজ্ঞানের অকৃপণ প্রয়োগ ও প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ এ দুই-এর বৈষম্য পীড়াদায়কভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি যন্ত্রবিদ্যার সম্ভাবনার কথা বলে আসছি। বারবার আমি কানাডায় আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা

ও বিজ্ঞান যা সম্ভব করতে পারত এই দুই-এর ব্যবধান দূর করবার চেষ্টা করে ব্যর্থতা বোধ করেছি। আমি যার কল্পনা করেছি কখনও কখনও তা পাগলামি বোধ হয়েছে অন্যের কাছে। কিন্তু উন্নততর জীবনযাত্রার এই আশ্চর্য সম্ভাবনা জেট্ প্লেন, রাডার বা নিলন্ বস্ত্রের মতই বাস্তব সত্য। এর মধ্যে আজগুবী ব্যাপার হচ্ছে শুধু এই আশা করা যে মুমূর্ষু ধনতন্ত্র জনসাধারণের জন্য এ সবের ব্যবস্থা করবে।

গবেষকরা পর্দার পিছনে একচেটিয়া ব্যবসার ধূর্ত নির্মমতার মধ্যেই ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করেন।

আগেকার যুগে ধনিকেরা শ্রেষ্ঠ যন্ত্র-বিশেষজ্ঞদের ঘুষ দিয়ে ভদ্রলোক বানিয়ে তাদেরই মজুর কমরেডদের শত্রু করে তুলত। আজকাল সে কাজই চলে বিজ্ঞানী—এঞ্জিনীয়ার, যন্ত্রবিদ্যার অধ্যাপকদের নিয়ে। এঁদের কয়েকজন বিজ্ঞানের মহান ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যে একচেটিয়া ব্যবসার কাছে আত্মবিক্রয় করেন; অধিকাংশেই থাকেন হুঁশিয়ার ও চুপচাপ।

এইভাবে বিজ্ঞান ও জনসাধারণের মধ্যেকার দূরত্ব বজায় রাখা হয়। বিজ্ঞানী ও শিল্পীদের ঐতিহ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা—এই একান্ত ভূয়া কাহিনী অন্তঃসারশূন্য বুদ্ধিজীবীরাই চালু রাখতে পারে। কিন্তু যখনই কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তখনই সমস্ত যুক্তি-বিরোধিতা ছাপিয়ে বেরিয়ে আসে সেই আপোষহীন সংগ্রামের রূপ—কোটি কোটি মজুর ও জনসাধারণের সঙ্গে মুষ্টিমেয় পুঁজিদার, শোষক ও তাদের রাষ্ট্রের শ্রেণীসংগ্রাম।

টিম, বড় হবার পর থেকেই তোমার সারা জীবন কাটছে শ্রেণীসংগ্রামের সামনের পংক্তিতে লড়াই করে। তুমি জানো সোজাসুজি একজন খনি

বা মিল মজুর কম্যুনিস্ট নীতির যাথার্থ্যও ধরতে পারে। কিন্তু ভাবো একবার আজকের দিনে বিজ্ঞানী বা এঞ্জিনীয়ারদের বিপত্তির কথা। তাঁর মধ্যে যদি হৃদয়াবেগের কণাটুকু অবশিষ্ট থাকে বা এতটুকু মানুস' প্রেমের স্বপ্ন তবে যতই তিনি ছুনিয়াটাকে পরখ করেন ততই জীবন তাঁর কাঁছে হয়ে দাঁড়ায় পীড়াদায়ক।

প্রাণতত্ত্ব, চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কার শ্যাপ্লী কবিত্বময় ভাষায় আমাদের হাতে দিয়েছে "দেবদূতদেরও উপরে মানুষকে তুলবার ক্ষমতা।" এই শক্তির কণ্ঠরোধ করে সেই শ্রেণী যারা আমাদের সমাজ ও বিজ্ঞানের মালিক—অর্থাৎ শিল্প ও টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রের একচেটিয়া মালিকেরা। ফ্যাসিজম হার মানার পর এদের কাছে ভবিষ্যত একটি মাত্র দুরূহ সমস্যা উপস্থিত করেছে—কেমন করে সমাজতন্ত্রের দিকে মানুষের অভিযান ঠেকানোর পন্থা খুঁজে পাওয়া যায়।

এখন জনসাধারণের সব থেকে নির্বোধ শত্রুরা আণবিক বোমা নিয়ে খুব উল্লাস করছে কারণ তারা সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস করার জন্য এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করার কথা ভাবছে। এই কাজে তারা দেখবে যে হিটলারের আর্যশ্রেষ্ঠদের মত ইউরেনিয়মও সমান নিস্ফল। আর আণবিক বিস্ফোরণের তীব্র আলোয় ধনতন্ত্রের দেউলিয়া অবস্থা আরো কত ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে দেখ! আমরা আজকাল যে শক্তি ব্যবহার করি তার চেয়ে কোটি গুণ প্রবলতর এই আণবিক শক্তি যে যুদ্ধের সময় ক্ষিপ্রগতিতে উৎপন্ন করা হল আর এখন শান্তিপূর্ণ কাজে তার প্রয়োগে যে বাধা দেওয়া হচ্ছে এ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়।

'প্রয়োগ' শব্দটি অভ্যস্ত করুণ। রাদারফোর্ড বলেছিলেন যে আণবিক শক্তি

মানুষের সত্যকার ইতিহাসের সূত্রপাত করবে। কিন্তু টিম, তিনি ভুল করেছিলেন কারণ আণবিক শক্তি "প্রয়োগ" করতে পারে না মুমূর্ষু ধনতন্ত্র। আণবিক শক্তির মুক্তি ও অন্যান্য বিরাট আবিষ্কার সম্ভব শুধু সমাজতন্ত্রের আমলেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সোভিয়েট শক্তিই হল মানুষের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের ইঙ্গিত। শত শত বিজ্ঞানী ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের এই অপরিহার্য ঐক্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন।

তবু শাসকশ্রেণীর উপর আর্থিক নির্ভরতার জন্য যন্ত্রবিদের চোখ পুরোপুরি ফোটেনি। এর ফলে ভয় ও তাঁর উপরে যে সব সাংস্কৃতিক চাপ দেওয়া হয় তার উন্নাসিকতা একত্র হয়ে তাঁর সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি খর্ব করে এবং তাঁকে মজুরদের থেকে দূরে রাখে। এই মজুরেরাই শুধু পারে তাঁর সবব্যাপী দাসত্ব ঘোচাতে।

সৌভাগ্যক্রমে আমি এই মানসিক ও নৈতিক দুর্গতি থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলাম। তুমি জানো মাঝে মাঝে কতকগুলি "পারিপার্শ্বিকের খোঁচা" আমায় বাধ্য করে চূড়ান্তভাবে চিন্তা ও কাজ করতে। সংশয়াপন্নদের জন্য আমার প্রিয় দাওয়াই হচ্ছে—"সক্রিয়তা"। যারা ভয় পান বা যারা যুক্তিজাল বিস্তার করে দ্বন্দ্বের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন তাঁদের সব থেকে ভালো উত্তর হল রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ। হলডেন, জোলিও-কুরী, লাঁজভাঁ, ব্লক, আরাগঁ, পিকাসো···বড় বড় বিজ্ঞানী ও শিল্পীরা পর্যন্ত স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এই পথেই সোজাসুজি এগিয়ে এসেছেন কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য হওয়ার দিকে।

সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা কথা বলব। শুধু সোভিয়েটেই "সংস্কৃতি" জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী সকলেরই সম্পূর্ণ বোধগম্য ব্যাপার। কারণ সংস্কৃতি অর্থাৎ শিল্প ও বিজ্ঞানগুলির সমন্বয় সেখানে সমগ্র জাতির

সম্পত্তি। মুনাফা-লিপ্সার দ্বারা সে সংস্কৃতি কলুষিত নয় আর সংস্কৃতি সম্পর্কে সত্যকার ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক ধারণা দ্বারা তা পুষ্ট।

টিম, আমি এখানে বলতে চাই যে বামপন্থী সংস্কৃতি অনুরাগীর দলের 'উদারপন্থী' সাহিত্যিক ধারা সম্পর্কে বেশ খানিকটা রঙিন স্বপ্ন দেখার ঝোঁক আছে। গল্প লেখক হিসাবে আমি খানিকটা সফলতা অর্জন করেছিলাম—একবার হলিউডে বেশ আরামের একটি চাকরী ও আর একবার রেডিও নাটক লেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই সব লোভ আমার পক্ষে কিছুটা মজার ব্যাপার হলেও আমার চেয়েও অনেক বেশী প্রতিভাবান বহু তরুণ কানাডিয়ানের পক্ষেই সর্বনাশের কারণ হয়েছে। এমন কি গল্প উপন্যাস ছাড়া অন্য রচনা প্রকাশের বেলায়ও জনসাধারণের কাছে পৌঁছবার জন্য আমায় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের ছেড়ে একেবারে ভিন্ন ধরনের নূতন ব্যবস্থা দেখতে হয়েছিল।

আমাদের রঙিন স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। বিজ্ঞানের মত কানাডায় সাহিত্যও ধনতন্ত্রের কদর্য কবলে পড়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, তার বাঁচবার প্রাথমিক অধিকার—এই সবই ধনবাদী সমাজের শয়তানীতে গুঁড়িয়ে যায়। এটি আরো পরিতাপের বিষয় এই জন্য যে আমাদের প্রতিভাবান তরুণদের মন অত্যন্ত সুকুমার আর মজুরদের কাছেও তারা সাদর আহ্বান বা আশ্রয় পায়নি। আমি চাই এ অবস্থার পরিবর্তন। কানাডার কম্যুনিস্টরা অন্য দেশের মতই সমগ্র মানবতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পতাকাবাহী এ কথা স্বীকার করলেই যথেষ্ট হল না। সে দৃপ্ত পতাকা আমাদের তুলে ধরতে হবে যাতে আমাদের সংস্কৃতি-স্রষ্টারা পান সাহস ও দৃঢ়তা।

তুমি ও অন্য নেতৃস্থানীয় কম্যুনিস্টরা আমায় দিয়েছ অমূল্য অনুপ্রেরণা কিন্তু বাঁধনি কোনো রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ববন্ধনে। পার্টির ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা

পাণ্ডুলিপি দেখা বা গ্রন্থ প্রকাশ ব্যবস্থার কাজে আমার সঙ্গে বহুক্ষণ কঠিন পরিশ্রম করেন। কিন্তু মজুর ও চাষী যে বিপুল জনসংঘের সামনে আমি বক্তৃতা দেই বা অনেকে যারা আমায় চিঠি লেখে—সব চেয়ে বেশী এই কানাডাবাসীরাই পারে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রচণ্ড উৎসাহ যোগাতে। যতই আমি জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ হতে লাগলাম ততই প্রকাশ্য ভাবে কেউ কেউ যে আমায় ছদ্মবেশী কম্যুনিস্ট বলে অভিযোগ করতে লাগল এ অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। তুমি জানো আমার অভিযোক্তারাও জানত যে আমার কখনো কোনো রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ধনতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা চেষ্টা করে যাতে জনসাধারণ না জানতে পারে বিজ্ঞান সমাজতন্ত্রের আমলে আমাদের কি দিতে পারে। আমি যখন প্রচণ্ডভাবে আসল কথা খুলে বলতে লাগলাম এই শ্রেণীশক্রুরা তখন আবার পুরোনো কম্যুনিস্ট-লাঞ্ছনার পথ ধরল। এই অভিজ্ঞতা আমার রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা আরো তীব্র করে তুলল ও আমায় আরো পার্টির কাছে টানল।

যাই হোক আমার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক পাঠাভ্যাস ও যুক্তিতর্ক আমায় L. P. P র সদস্য পদের দিকে এগিয়ে দিতে মস্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। আজ আমি পার্টিতে যোগ দিচ্ছি, কারণ অবশেষে আমি বুঝতে পারছি যে রাষ্ট্রনীতি হচ্ছে একটা বিজ্ঞান। মার্কস্ ও এঙ্গেলসের সৃষ্টি এবং লেনিন কর্তৃক সোভিয়েট শক্তি আবিষ্কার ও স্টালিনের অতুলনীয় ঐতিহাসিক কীর্তি দ্বারা সমৃদ্ধ এই বিজ্ঞান এখন L p pর মধ্যে বিকাশ লাভ করছে।

বিজ্ঞানের একটা চূড়ান্ত কষ্টিপাথর আছে—তার ভবিষ্যদ্বাণী কি খাটে? মার্কস্, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিনের বই আজ পড়লে বোধ হয় যেন দুনিয়ার গবেষণাগারে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণীর পরীক্ষা দেখছি। কানাডার

কম্যুনিস্টদের সিদ্ধান্ত, কর্মতালিকা ও কর্মসূত্র সম্পর্কেও ঐ এক কথাই বলা চলে। আমাদের দেশে যারা কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের নিন্দা করে তারা কি অসম্ভব অন্ধ! আমাদের সময়কার মূল প্রশ্ন সম্পর্কে তুমি ও তোমার কমরেডরা আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়েছিলে যেমন মুসোলিনী, হিটলার, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, ত্রিশ দশকের সংকট, স্পেন, এবিসিনিয়া, মিউনিকে বৃটিশের কলঙ্ক, ফ্রান্সের ভাগ্য এবং কানাডার রাজনীতির একটার পর একটা সংকটের ব্যাপারে।

আমি জন্মেছি দেশপ্রেমিক বৃটিশ পরিবারে। কানাডার প্রতি আমার ভালোবাসা, আমার দেশপ্রেম, বৃটিশ জন্মভূমির জনগণের প্রতি প্রবল নিষ্ঠা এ সবও আমায় কম্যুনিস্ট করে তুলেছে! এই যুদ্ধই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে যে কম্যুনিস্টরাই সব দেশে বিশ্বস্ত দেশপ্রেমিক। বৃটেনের প্রতি কার নিষ্ঠা বেশী---১৯৩৫ সালে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রীর কথা তুলেছিল যারা সেই কম্যুনিস্টদের, না ১৯৪১ সালে বাধ্য হয়ে সে পথে পা বাড়ালো যে টোরীরা তাদের? কে বড় ফরাসী—বোর্সের ডাকাত ও পেতাঁর ধ্বজাধারী চেলাচামুণ্ডারা না F F I-এর কম্যুনিস্টরা।

আর এখানে কানাডায় কারা জাতির স্বার্থ-রক্ষা করেছে—চেম্বারলেনের লোক-দেখানো যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য কারারুদ্ধ হল যে কম্যুনিস্টরা তারা, না ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে যে সব প্রতিক্রিয়াপন্থী একমাত্র যে সোভিয়েটের শক্তি সমস্ত সভ্যজগতকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করল তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে উন্মুখ হয়েছিল, তারা?

মিথ্যার বেসাতি করে মোটা মুনাফা যারা লোটে তাদের প্রচারে বিভ্রান্ত মানুষ ছাড়া আর সবারই কাছে এ সবের উত্তর অনাবশ্যক।

তোমায় এত লম্বা চিঠি লিখছি বলে মাফ করো। আরো অনেক কথা ছিল বলবার। হয়ত সব থেকে দরকারী কথা হল এই যে বছর কয়েক

আগে সমাজতান্ত্রিক কানাডার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমার শক্তি ও সামর্থ নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেবার পর জীবন আমায় শেখালো যে L P Pর মার্কসীয় কর্মপন্থা অনুসরণ ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আর কোনো সম্ভব পথ নাই—এই কারণেই আমি পার্টিতে যোগ দিয়েছি।

আমার হাজার হাজার C C F বন্ধুদের কাছে আমি বোঝাবার চেষ্টা করব কানাডার পক্ষে সত্যকার সমাজতন্ত্র বলতে কি বোঝায় আর কি করে আমাদের ডোমিনিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাসির রাষ্ট্রনৈতিক বিপদ এড়াতে পারে যার ফলে শুধু সাধারণের শত্রুরাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মার্কস্‌বাদকে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে উল্লেখ করেছি। অন্য সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে L P Pর জীবন্ত রাষ্ট্রনৈতিক কার্যক্রমই আমায় পার্টির মধ্যে টেনেছে। এইখানে আমি দেখতে পাই সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম বৈজ্ঞানিক পথে ও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়েছে কানাডার আশু ও তীব্র সমস্যাগুলির সঙ্গে—কাজ, বাড়ী, সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তির লড়াই, অভাবের সর্বনাশী অর্থনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পারিশ্রমিকের বিরুদ্ধে জঘন্য বৈষম্য নীতি দূরীকরণ, ইউনিয়নগতভাবে নিরাপত্তা, বাসস্থানে ও বৃদ্ধদের আশ্রয়, চাষীদের জন্য ফসলের বাঁধা দর প্রভৃতি অর্জন।

এইই হল একমাত্র বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রনৈতিক কাজ যা সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দেয়। সামাজিক উন্নতিলাভের এই হল লড়াই। ধনতন্ত্রের আমলেও এ উন্নতি অর্জিত হয়েছে ও হতে পারে। এই সংগঠিত লড়াইএর প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে মানুষ এগোবে সমাজতন্ত্রের পথে।

পিছনের দশ বছরের দিকে ফিরে আমার মনে হয় যে ঐ পথে ইতিমধ্যে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়েছি। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের যুদ্ধ ভুলে যাবার আকস্মিক ইচ্ছার পিছনে কি আছে? যেন আমরা সেই চূড়ান্ত দুনিয়া-জোড়া বিজয়, একচেটিয়া ধনবাদীদের সর্বনাশা ফ্যাসিজমের নৃশংস

সামরিক শক্তির সম্পূর্ণ বিনষ্টি কখনও ভুলতে পারি! এই বিজয়লাভে সারা দুনিয়ার মানুষ মেহনত ও লড়াই-এর ক্ষেত্রে এমনভাবে এসে মিলেছিল ইতিহাসে যার জুড়ি মেলে না। শান্তি আসার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মহাদেশগুলিতে জনসাধারণ শুরু করেছে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার জয়যাত্রা। এ কথা অস্বীকার করতে পারে কে?

দ্বিধাগ্রস্তরাই শুধু প্রতিক্রিয়াশীলতার সমরোত্তর ভ্রূকুটি দেখে ভয় পায়। আমরা আজ চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছি এমন দৃশ্য ধনতান্ত্রিক যুগের উন্মেষের পরে যা কখনও দেখা যায় নি: সারা দুনিয়া জুড়ে আজ প্রতিক্রিয়ার শক্তি নয়—অগ্রগতির শক্তি এগিয়ে চলেছে।

এবার টিম L. P. P'র সভা হওয়া সম্পর্কে একটা কথা বলি। পার্টি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। কিন্তু কোনো কোনো লোক যে এতে যোগ দেয়নি তার কিছু কারণ আছে। শুধু মজুর নয় বৃত্তিজীবীদের সময় একটা খোলাখুলি কারণ থাকে। তারা ভাবে পার্টির সভ্য হলে নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে।

আমাদের উচিত তাদের এই কথা চিন্তা করতে বলা...ধনতন্ত্রে কি সত্যকার নিরাপত্তা আশা করা যেতে পারে?

এর বাইরেও তাদের চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বহু য়ুরোপীয় দেশ সমাজতন্ত্রের পথে এগোচ্ছে, ঔপনিবেশিক জনগণের অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে, ভয়ে কাঁপছে সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ আশ্চর্য সংস্কার পরিকল্পনা সব দেশের মানুষের কল্পনাকেই স্পর্শ করেছে। এ সবই ক্ষুণ্ণ করছে ধনতান্ত্রিক নিরাপত্তা। এ শুধু তোমার আমার মাইনের প্রশ্ন নয়। সংশয়াক্লিষ্ট সমাজতান্ত্রিকের সামনে প্রশ্ন হল—কানাডায় বিপুল প্রগতিপন্থী শক্তির জোর বাড়াবো, না বসে থাকব ক্রমবর্ধমান দুর্গতি সহ্য করে।

শেষ কথা বলি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বহু আন্তরিকতাসম্পন্ন লোক মার্কসবাদী পার্টির সভ্য হওয়া সম্পর্কে সংশয়াপন্ন হয়—তার মধ্যে আত্মত্যাগের বিষণ্ণ ছায়ার আশঙ্কা করে। আমরা এই সব বন্ধুদের প্রশ্ন করতে পারি—ত্যাগের কথা বলছ?

আজ আমাদের সমগ্র জাতিই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার যূপকাষ্ঠের বলি। আমাদের শহরের বস্তি, আমাদের চাষীদের জঘন্য দৈন্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ব্যর্থতা, জীবন ধারণের উপযোগী বেতনের জন্য মজুরদের সুদৃঢ় সংগ্রাম এ সবের কথা ভাবো। আরো এরি পাশে ভেবে দেখ বিত্তশালীর অশ্লীল ভোগৈশ্বর্য!

মুষ্টিমেয় ধনী শোষক ছাড়া প্রত্যেক নরনারী ও শিশু—আমরা সবাই বুদ্ধিহীন ও লুব্ধ প্রতিক্রিয়ার কবলে কোনোক্রমে টিঁকে থাকার জন্য আমাদের অমূল্য জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস ও বছর নষ্ট করছি।

ইতিমধ্যে সীমাহীন স্বাস্থ্য, সুখ, স্বাধীনতা, সানন্দ উচ্চাকাঙ্ক্ষা—যা কিছু সমাজতন্ত্রে পাওয়া সম্ভব ও আমরা পাবই—যা কিছু মানুষকে ডাকছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে—সবই ধনতন্ত্রের কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে। তাহলে জনগণের মার্কসবাদী অগ্রণীদের সঙ্গে যোগ দিতে হলে ত্যাগের কথা কে তুলতে পারে?

টিম, আমার পক্ষে পার্টির সভ্যপদ পাওয়া হল সব থেকে বড় সম্মান। 'আত্মত্যাগের' কথা কেন ওঠে আমি বুঝি না। যারা নিজেদের ও আপন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা নিয়েই আমি বড় হয়ে উঠেছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়াবেগ দিয়ে শিখতে হবে আমাদের ঘৃণাকে একদিকেই প্রয়োগ করতে, জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা

ও গ্লানিকে ঘৃণা করতে। তাহলেই আমরা মানুষের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য আমাদের মানব প্রেমের সত্যকার মর্যাদা দিতে পারব।

তোমার আন্তরিক কমরেড,

ডাইসন কার্টার